শ্রী সাই সৎচরিত্র

(SHRI SAI SATCHARITRA)

শ্রী সাই সৎচরিত্র

(SHRI SAI SATCHARITRA)

শ্রী সাই সৎচরিত্র

(SHRI SAI SATCHARITRA)

শ্রী সাই সৎচরিত্র

(SHRI SAI SATCHARITRA)

SRI SAI SATCHARITRA

শ্রী সাই সৎচরিত্র

(শ্রী সাইবাবার বিস্ময়কর জীবনগাথা এবং অমূল্য উপদেশ)

মূল মারাঠী গ্রন্থ লেখক

শ্রী গোবিন্দ রাও রঘুনাথ দাভোলকার (হেমাডপন্ত)

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমতি সুমনা বাগচী (মীরা)

নতুন দিল্লী

প্রকাশক ঃ

সভাপতি

শ্রী সাইবাবা সংস্থান, শিরডী

প্রাপ্তিস্থান ঃ

1) Shri Sai Baba Sansthan Trust, Shirdi,
At-Post - Shirdi, Dist. - Ahmednagar.

2) Shri Sai Baba Sansthan Trust, Shirdi,
'Sai Niketan', 804-B, Dr. Ambedkar Road,
Dadar, Mumbai-400 014

Ⓒ শ্রী সাই বাবা সংস্থান কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ব সংরক্ষিত।

তৃতীয় সংস্করণ ঃ-

রামনবমী এপ্রিল - **২০০৯**

৫০০০ কপি/5000 Copies

অক্ষর বিন্যাস

এম. আর. প্রিন্টার্স

বার্তালোপন ঃ **০৯৮৭১৭২৯৪২৭, ০৯৮১৮২৫২৬২৯**

মুদ্রণ ঃ-

মূল্য ঃ-

৩৫ টাকা মাত্র (Rs. 35/- Only)

জপনাম-১০৮

ওঁ শ্রীসাইনাথায় নমঃ
ওঁ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নমঃ
ওঁ শ্রীকৃষ্ণ রাম শিব মারুত্যাদি রূপায় নমঃ
ওঁ শেষ শয়ন নমঃ
ওঁ গোদাবরীতট শ্রীদ্ধিবাসিনে নমঃ
ওঁ ভক্তহৃদয়ালয়ায়ে নমঃ
ওঁ সর্ব্বহৃদনিলয়ায়ে নমঃ
ওঁ ভূতাবাসয়ে নমঃ
ওঁ ভূতভবিষ্যৎভাব বর্জ্জিতায় নমঃ
ওঁ কালাতীতায় নমঃ (১০)
ওঁ কালায় নমঃ
ওঁ কালকালায় নমঃ
ওঁ কালদর্পদমনায় নমঃ
ওঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় নমঃ
ওঁ অমৃতায় নমঃ
ওঁ মৃত্যুভয় অভয়প্রদায় নমঃ
ওঁ জীবধারায় নমঃ
ওঁ সর্ব্বধারায় নমঃ
ওঁ ভক্তগণ সমর্থায় নমঃ
ওঁ ভক্তগণ প্রতিজ্ঞায় নমঃ (২০)
ওঁ অন্নবস্ত্রদাত্রে নমঃ
ওঁ আরোগ্যক্ষেমাদাত্রে নমঃ
ওঁ ধনমঙ্গলদাত্রে নমঃ
ওঁ হৃদি শ্রীদ্ধিদাত্রে নমঃ
ওঁ পুত্র মিত্র কলত্র বন্ধু দাত্রে নমঃ
ওঁ যোগক্ষেমবহায় নমঃ
ওঁ আপদ্বান্ধবায় নমঃ
ওঁ মার্গবান্ধবায় নমঃ
ওঁ ভুক্তি মুক্তি প্রদায় নমঃ
ওঁ প্রিয়ায় নমঃ (৩০)
ওঁ প্রীতিবর্দ্ধনায় নমঃ
ওঁ অন্তর্যামিনে নমঃ
ওঁ সচ্চিদানন্দ স্বরূপিনে নমঃ
ওঁ নিত্যানন্দায় নমঃ
ওঁ পরমসুখদায় নমঃ
ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ
ওঁ পরমব্রহ্মণে নমঃ
ওঁ পরমাত্মাণে নমঃ
ওঁ জ্ঞান স্বরূপিনে নমঃ
ওঁ জগতঃ পিত্রে নমঃ (৪০)
ওঁ ভক্তানাম মাতৃপিতৃপিতামহায় নমঃ
ওঁ ভক্তাভয়প্রদায় নমঃ
ওঁ ভক্তপরাধীনায় নমঃ
ওঁ ভক্তানুগ্রহ কাতরায় নমঃ
ওঁ শরণাগতবৎসলায় নমঃ
ওঁ ভক্তি শক্তি প্রদায় নমঃ
ওঁ জ্ঞান বৈরাগ্যদায় নমঃ
ওঁ প্রেম প্রদায় নমঃ
ওঁ সংশয় দৌর্ব্বল্য পাপকর্ম্ম বাসনা ক্ষয়করায় নমঃ
ওঁ হৃদয় গ্রন্থি ভেদকায় নমঃ (৫০)
ওঁ কর্ম্ম ধ্বংসিনে নমঃ
ওঁ শুদ্ধ সত্যস্থিতায় নমঃ
ওঁ গুণাতীত গুণার্পণে নমঃ
ওঁ অনন্ত কল্যাণগুণায় নমঃ
ওঁ অমিত পরাক্রমায় নমঃ
ওঁ জয়িনে নমঃ
ওঁ দুর্দ্ধর্ষ ক্ষয়ায় নমঃ
ওঁ অপরাজিতায় নমঃ
ওঁ ত্রিলোকেষু অভিধাতৃগতায়ে নমঃ
ওঁ অশোক্যরোহিতায় নমঃ (৬০)
ওঁ সর্ব্বশক্তি মূর্ত্তয়ে নমঃ
ওঁ সুরূপ সুন্দরায় নমঃ
ওঁ সুলোচনায় নমঃ
ওঁ বহুরূপ বিশ্বমূর্ত্তায় নমঃ
ওঁ অরূপাভিব্যক্তায় নমঃ
ওঁ অচিন্তায় নমঃ
ওঁ সূক্ষায় নমঃ
ওঁ সর্ব্বন্তর্যামিনে নমঃ
ওঁ মনোবাগাতীতায় নমঃ
ওঁ প্রেমমূর্ত্তায় নমঃ (৭০)
ওঁ সুলভ দুর্লভায় নমঃ
ওঁ অসহায় সহায়ায় নমঃ
ওঁ অনাথনাথ দীনবান্ধবায় নমঃ
ওঁ সর্ব্বভারভূতে নমঃ
ওঁ অকর্ম্মননেক কর্ম্ম সুকর্ম্মনে নমঃ
ওঁ পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তনেয় নমঃ
ওঁ তীর্থায় নমঃ
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ
ওঁ সতাংগতয়ে নমঃ
ওঁ সৎপরায়ণায় নমঃ (৮০)
ওঁ লোকনাথায় নমঃ
ওঁ পাবনহৃদয়ায় নমঃ
ওঁ অমৃতাংশবে নমঃ
ওঁ ভাস্কর প্রভায় নমঃ
ওঁব্রহ্মচারী তপশ্চারিয়াদি সুদ্রতায়ে নমঃ
ওঁ সত্য ধর্ম্ম পরায়ণায় নমঃ
ওঁ সিদ্ধেশ্বরায় নম ঃ

ওঁ সিদ্ধ সঙ্কল্পায় নমঃ

ওঁ যোগেশ্বরায় নমঃ

ওঁ ভগবতে নমঃ ৯০

ওঁ ভক্তবৎসলায় নমঃ

ওঁ সৎপুরুষায় নমঃ

ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ

ওঁ সত্য তত্ত্ব বোধকায় নমঃ

ওঁ কামাদি ষড়বৈরীধ্বংসিনে নমঃ

ওঁ অভেদানন্দসুভাবপ্রদায়য়ে নমঃ

ওঁ সমসর্ব্বমর্ত্ত স, মতায় নমঃ

ওঁ শ্রীদক্ষিণমূর্ত্তায় নমঃ

ওঁ শ্রীভেঙ্কটেশরমণায় নমঃ

ওঁ অদ্ভুতানন্দচারিয়ায়ে নমঃ ১০০

ওঁ প্রপন্নাথিহরায় নমঃ

ওঁ সংসার সর্ব্বদুঃখ ক্ষয়করায় নমঃ

ওঁ সর্ব্ববিধ সর্ব্বোতমুখায় নমঃ

ওঁ সর্ব্বঅন্তর্বহিঃস্থিতায় নমঃ

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলকরায় নমঃ

ওঁ সর্ব্বভিষ্টাপ্রদায় নমঃ

ওঁ শ্রীসমরস সন্মার্গস্থাপনায় নমঃ

ওঁ শ্রীসমর্থ সৎগুরু সাইনাথায় নমঃ ১০৮

শ্রী সাই সৎচরিত্র

বিষয় সূচী

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠ
(১)	বন্দনা, গম পেষার কাহিনী এবং তার তাৎপর্য্য	1
(২)	গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য, অর্থপূর্ণ উপাধি হেমাডপন্ত, গুরুর প্রয়োজনীয়তা	6
(৩)	শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি, আদেশ ও প্রতিজ্ঞা, বাবার লীলা, রোহিলার কাহিনী, বাবার মধুর অমৃতোপদেশ	16
(৪)	শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন, সাইবাবার ব্যক্তিত্ব, গৌলীবুয়ার অভিজ্ঞতা, ক্ষীর সাগরের কথা, দাসগণুর প্রয়াগ স্নান, তিনটি 'ওয়াড়া'	24
(৫)	চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে সাইবাবার পুণঃ আগমন, 'শ্রী সাই' শব্দ দ্বারা সম্বোধন, অন্য সন্তদের সাথে সাক্ষাৎ, বেশভূষা ও দৈনন্দিন কর্মসূচী, পাদুকার কথা, মোহিদ্দীনের সাথে কুস্তি, মোহিদ্দীনের জীবন পরিবর্তণ, জলের তেলে রূপান্তর, নকল গুরু জৌহর আলী।	34
(৬)	রামনবমীর উৎসব, মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার, গুরুর করস্পর্শের মহিমা, চন্দন সমারোহ, 'উর্স' এবং রামনবমীর মন্বয়	46
	সপ্তাহ পারায়ণ ঃ প্রথম বিশ্রাম	
(৭)	অদ্ভুত অবতার, শ্রী সাইবাবার প্রকৃতি, ওঁর সর্বব্যাপকতা, কুষ্ঠ রোগীর সেবা, খাপার্ডের ছেলের প্লেগ, পন্ঢরপুর যাত্রা।	57
(৮)	মানব জন্মের গুরুত্ব, শ্রী সাইবাবার ভিক্ষাবৃত্তি, বায়জাবাইয়ের সেবা, শ্রী সাইবাবার শয়নকক্ষ,	68

খুশালচন্দের প্রতি তাঁর প্রেম।
(৯) রওনা হওয়ার সময় বাবার আজ্ঞা পালন এবং অবজ্ঞা করার পরিণামের কয়েকটি উদাহরণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও তার আবশ্যকতা, ভক্তদের (তর্খড পরিবারের) অভিজ্ঞতা। **76**
(১০) শ্রী সাইবাবার জীবনধারা, তাঁর শোওয়ার তক্তা, শিরডীতে তাঁর অবস্থান, তাঁর উপদেশ এবং বিনয়, সহজতম পথ। **86**
(১১) 'সগুণ ব্রহ্ম' শ্রী সাইবাবা, ডাক্তার পন্ডিতের পুজো, হাজী সিদ্দীক ফালকে, তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ। **95**
(১২) কাকা মহাজনী, ধূমাল উকিল, শ্রীমতি নিমোণকর, নাসিকেব মূলে শাস্ত্রী, একটি ডাক্তারের অভিজ্ঞতা (বাবার লীলার)। **102**
(১৩) অন্য কয়েকটি লীলা - আরোগ্যপ্রদান ঃ **109**
১) ভীমাজী পাটীল **২)** বালা গণপত্ দর্জী
৩) বাপুসাহেব বুটী **৪)** আলন্দী স্বামী
৫) কাকা মহাজনী **৬)** হরদার দত্তোপন্ত

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্রাম

(১৪) নাদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া, সন্ত মৌলাসাহেব, দক্ষিণা মীমাংসা, গণপত্ রাও বোড্স, শ্রীমতি তর্খড, দক্ষিণা মর্ম। **117**
(১৫) নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি, শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা, দুটো টিকটিকি। **126**
(১৬-১৭) শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, তার জন্য যোগ্যতা, বাবার উপদেশ, বাবার বৈশিষ্ট্য। **131**
(১৮-১৯) শ্রী হেমাডপন্তের উপর বাবার কৃপা কিভাবে হয়, শ্রী শাঠে ও শ্রীমতি দেশমুখের গল্প, উত্তম বিচারকে উৎসাহ প্রদান, নিন্দে সম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরিশ্রমের জন্য মজুরী। **140**
(২০) শ্রী কাকাসাহেবের ঝিয়ের দ্বারা শ্রী দাসগণুর সমস্যার বিলক্ষণ সমাধান, অদ্বিতীয় শিক্ষা পদ্ধতি, ঈশোপনিষদের শিক্ষা। **159**
(২১) **১)** শ্রী ভি. এইচ. ঠাকুর **২)** শ্রী অনন্ত রাও পাটন্কর ও **৩)** পন্ঢরপুরের উকিলের গল্প। **166**

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ তৃতীয় বিশ্রাম

(২২) সর্প-বিষ হতে রক্ষা ঃ **১)** শ্রী বালাসাহেব মিরীকর **২)** শ্রী বাপুসাহেববুটী **৩)** শ্রী আমির শক্কর **৪)** শ্রী হেমাডপন্ত **৫)** বাবার মতামত। **173**
(২৩) যোগ ও পোঁয়াজ, সর্পদংশন থেকে শামার আরোগ্যলাভ, বিসুচিকা নিবারণার্থে নিয়মের উল্লংঘন, গুরুভক্তির কঠিন পরীক্ষা। **181**
(২৪) শ্রী বাবার হাস্যবিনোদ, ভাজা ছোলার লীলা (হেমাডপন্ত), সুদামার কাহিনী, আন্না চিঞ্চনীকর ও মৌসীবাঈ-এর গল্প, বাবার ভক্তপরায়ণতা। **188**
(২৫) **১)** দামু আন্নাকাসার - আহমদনগরের তুলো ও ধানের ব্যবসা, **২)** আম্রলীলা, প্রার্থনা। **196**
(২৬) **১)** ভক্ত পন্ত **২)** হরিশচন্দ্র পিত্লে ও **৩)** গোপাল আম্বেডকরের কাহিনী। **204**
(২৭) ভাগবৎ ও বিষ্ণু সহস্রনাম প্রদান করে অনুগৃহীত করা, গীতা রহস্য, দাদাসাহেব খাপার্ডে। **211**
(২৮) পাখীদের শিরডীতে টেনে আনা- **১)** লক্ষ্মীচন্দ, **২)** বুরহানপুরের মহিলারা, **৩)** মেঘার নির্বাণ। **220**

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ চতুর্থ বিশ্রাম

(২৯) **১)** মাদ্রাজী ভজন-মন্ডলী **২)** তেন্ডুলকর (পিতা ও পুত্র) **৩)** ডাঃ ক্যাপ্টেন হাটে **৪)** বামন নার্বেকরের কাহিনী **231**

(৩০) শিরডীতে আনয়ন ঃ ১) বণীর কাকা বৈদ্য ২) খুশালচন্দ 240
৩) বম্বের রামলাল পাঞ্জাবী।
(৩১) মুক্তিদান ঃ ১) সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ, ২) বালারাম মানকর 247
৩) নূলকর ৪) মেঘা ৫) একটি বাঘ।
(৩২) গুরু ও ঈশ্বরের খোঁজ ঃ উপবাস অমান্য, বাবার 'সরকার'। 255
(৩৩) 'উদী'-র মহিমা (ভাগ-১) ঃ বিছের কামড়, প্লেগের গাঁট, 266
জামনেরের চমৎকার, নারায়ণ রাও, বালা বুয়া সুতার,
আপ্পা সাহেব কুলকর্ণী, হরিভাউ কার্ণিক।
(৩৪) 'উদী'-র মহিমা (ভাগ-২) ঃ ডাক্তারের ভাইপো, 277
ডাক্তার পিল্লে, শামার বৌদি, ইরাণী কন্যা, হরদার
ভদ্রলোক এবং বম্বের মহিলার প্রসব পীড়া।
(৩৫) কাকা মহাজনীর বন্ধু ও 'শেঠ', নির্বীজ মনক্কা বান্দ্রার 286
এক গৃহস্থের অনিদ্রা, বালাজী পাটীল নেবাসকর, বাবার
সাপের রূপে প্রকট হওয়া।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ পঞ্চম বিশ্রাম

(৩৬) আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঃ ১) গোয়ার দুটি ভদ্রলোক 295
২) শ্রীমতী ঔরাঙ্গাবাদকর।
(৩৭) চাওড়ী শোভাযাত্রা। 304
(৩৮) বাবার হাঁড়ি, নানাসাহেব দ্বারা দেবমূর্তির উপেক্ষা, 310
নৈবেদ্য বিতরণ, ঘোলের প্রসাদ।
(৩৯) বাবার গীতা-শ্লোক ব্যাখ্যা, সমাধি-মন্দির নির্মাণ। 318
(৪০) শ্রী সাই বাবার কাহিনী ঃ ১) বি. ভি. দেবের মায়ের 328
উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগদান এবং
২) হেমাডপন্তের গৃহে চিত্ররূপে আগমন।
(৪১) ছবির কাহিনী, ন্যাকড়া চুরি এবং জ্ঞানেশ্বরী 335
পড়ার কাহিনী।
(৪২) মহাসমাধির দিকে ১) ভবিষ্যতের পূর্ব সূচনা, 342
রামচন্দ্র দাদা পাটীল এবং তাত্‌য়া কোতে
পাটীলের মৃত্যু এড়ানো, লক্ষ্মীবাঈ শিন্দেকে দান,
সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে বাবার বাস, শেষ সময়।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ ষষ্ঠ বিশ্রাম

(৪৩-৪৪) মহাসমাধির দিকে - ২) পূর্ব্বাভাস, সমাধি-মন্দির, 350
ইট খণ্ডন, ৭২ ঘন্টার সমাধি, বাপুসাহেব যোগের সন্ন্যাস,
বাবার অমৃততুল্য বচন।
(৪৫) সন্দেহ নিবারণ, কাকাসাহেব দীক্ষিতের সন্দেহ এবং 360
আনন্দরাও-এর স্বপ্ন, বাবার শোওয়ার জন্য তক্তা।
(৪৬) বাবার গয়া যাত্রা, দুটি ছাগলের পূর্বজন্মের কথা। 367
(৪৭) পূর্বজন্ম ঃ বীরভদ্রাপ্পা এবং চেনবসাপ্পার (সাপ ও ব্যাঙ) কথা। 373
(৪৮) ভক্তদের আপদ নিবারণ ঃ সদ্‌গুরুর লক্ষণ 380
১) শ্রী শেওড়ে এবং ২) শ্রী সপ্টণেকর ও
শ্রীমতি সপ্টণেকর ৩) সন্ততি দান।
(৪৯) পরীক্ষা ঃ ১) হরি কনোবা ২) সোমদেব স্বামী 388
৩) নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাহিনী।
(৫০) ১) কাকাসাহেব দীক্ষিত ২) শ্রী টেম্বে স্বামী, 395
৩) বালারাম ধুরন্ধরের কাহিনী।
(৫১) উপসংহার ঃ সদ্‌গুরু শ্রী সাইয়ের মহানতা, প্রার্থনা, 403
ফলশ্রুতি ও প্রসাদযাচনা।
আরতি
বাবার এগারোটি প্রতিশ্রুতি

শ্রী সাই সৎচরিত্র

অধ্যায় - ১

বন্দনা, গম পেষেন - এমন এক সন্ত, গম পেষবার কাহিনী এবং তার তাৎপর্য্য।

পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে, শ্রী হেমাডপন্ত এই শ্রী সাইসৎচরিত্রের শুভারম্ভ বন্দনা দ্বারা করেছেন।

১। সর্বপ্রথমে শ্রী গণেশকে সাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম করেন, যিনি সব কাজ নির্বিঘ্নে পূরণ করে তাঁকে যথাযথ রূপে যশস্বী করেছেন এবং মানা হয় যে, শ্রী সাইই আমাদের শ্রী গণেশ।

২। তারপর ভগবতী সরস্বতীকে, যাঁর দ্বারা কাব্য রচনার প্রেরণা তিনি পান এবং লোকে বলে শ্রী **সাই** ও ভগবতী ভিন্ন নন; তিনি নিজেই তাঁর জীবন সঙ্গীত সুরে বেঁধেছেন।

৩। তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশকে, যাঁরা যথাক্রমে উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার কর্ত্তা রূপে মান্য। লেখকের মতে শ্রী সাই এবং এই ত্রিমূর্তি অভিন্ন। তিনি স্বয়ং গুরু রূপে ভবসাগর পার করিয়ে দেন।

৪। তারপর নিজের কুলদেবতা শ্রী নারায়ণ আদিনাথের বন্দনা করেন, যিনি কিনা কোঁকণ প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোঁকন সেই পবিত্রভূমি, যেটি শ্রী পরশুরাম সমুদ্র থেকে বার করে স্থাপিত করেছিলেন। এরপর লেখক নিজের কুলের আদি পুরুষদের প্রণাম জানান।

৫। তারপর শ্রী ভরদ্বাজ মুনিকে, যাঁর গোত্রে তাঁর জন্ম। তারপর সেই ঋষিদের যেমন - যাজ্ঞবল্ক, ভৃগু, পরাশর, নারদ, বেদব্যাস,

সনৎকুমার, শুক, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, ইত্যাদি এবং আধুনিক সন্ত যেমন - নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, মুক্তাবাঈ , একনাথ, নামদেব, তুকারাম, নরহরি, ইত্যাদিদের নমস্কার করেন।

৬। তারপর তিনি প্রণাম জানান নিজের পিতামহ সদাশিব, পিতা রঘুনাথ এবং মাকে, যিনি ওঁর শৈশবকালেই মারা যান। এরপর নিজের বড় ভাই ও পালনকর্ত্রী কাকীমাকে, প্রণাম করেন।

৭। এরপর পাঠকবৃন্দকে নমস্কার করে অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন একাগ্রচিত্ত হয়ে এই কথামৃত পান করেন।

৮। শেষে শ্রী সচ্চিদানন্দ সদগুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজকে, যিনি কিনা শ্রী দত্তাত্রেয়-এর অবতার এবং ওঁর আশ্রয়দাতা। উনিই 'ব্রহ্ম সত্য ও জগত মিথ্যা'-র বোধ করিয়ে সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে একই ব্রহ্ম ব্যাপ্ত - এই সত্যের অনুভূতি করান।

শ্রী পরাশর, ব্যাস, শান্ডিল্য আদির ভক্তির নানান রূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে এবার গ্রন্থকার মহোদয় নিম্নলিখিত কথা আরম্ভ করেন।

গম পিষবার কাহিনী ঃ-

'১৯১০ সালে আমি একদিন ভোরবেলা শ্রী সাই বাবার দর্শনার্থে মস্‌জিদে যাই। কিন্তু ওখানকার বিচিত্র দৃশ্য দেখে, আমি খুবই অবাক হয়ে যাই। সাই বাবা হাত-মুখ ধুয়ে, গম পিষতে বসবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। মেঝের উপর একটা ছালার টুকরো বিছিয়ে, তার উপর যাঁতাকলটা রাখেন। এরপর খানিকটা গম ঢেলে, পেষবার কাজ আরম্ভ করে দেন।'

আমি ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে, গম পিষে বাবার কি

লাভ হবে? ওঁর তো পরিবার বলতে কেউই নেই এবং উনি নিজের জীবন নির্বাহ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাই করেন - তাহলে এই গম পেষা কেন? এই ঘটনাটা দেখে, সেখানে উপস্থিত বহুলোকের এই একই কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে, এমন সাহস কারো হচ্ছিল না। বাবার এই বিচিত্র লীলার খবর গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই দৃশ্য দেখবার জন্য তক্ষুনি লোকের ভিড় মস্‌জিদের দিকে দৌড়য়।

সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে চারজন নির্ভীক মহিলা ভিড় ঠেলে মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়ে গিয়ে এবং বাবাকে জোর করে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর হাত থেকে যাঁতার হাতলটা কেড়ে নিয়ে, বাবার লীলার গুণগান করতে করতে গম পেষা আরম্ভ করে দিলো। প্রথমে বাবা একটু রেগে যান, কিন্তু পরে মহিলাদের ভক্তিভাব দেখে শান্ত হয়ে মুচকি-মুচকি হাসেন। এদিকে গম পিষতে-পিষতে মহিলাদের মনে হয় যে 'বাবার তো কোন ঘর-বাড়ি নেই, কোন ছেলে-পিলেও নেই। তিনি স্বয়ং ভিক্ষাবৃত্তিরদ্বারাই জীবন যাপন করেন। সুতরাং তাঁর ভোজন ইত্যাদির জন্য আটার কিই বা প্রয়োজন? বাবা তো পরম দয়ালু। হতে পারে যে, এই আটা উনি আমাদেরই বিতরণ করে দেবেন।' এই কথা ভাবতে-ভাবতে ও গান গাইতে-গাইতে, ওরা সমস্ত গম পিষে ফেলল। এবার যাঁতাটি সরিয়ে, ওরা আটার চারটে সমান ভাগ করে নিয়ে নিজের-নিজের ভাগটি উঠিয়ে সেখান থেকে যেতে উদ্যত হয়। এতক্ষণ বাবা শান্ত হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু এইভাবে আটা নিয়ে যেতে দেখে, তিনি হঠাৎ রেগে উঠলেন এবং ওদের ভর্ৎসনা করে বলেন- "ওহে, তোমরা কি পাগল হয়ে গেছ? এটি কার বাপের সম্পত্তি মনে করে নিয়ে যাচ্ছ? এটা কি কোন পাওনাদারের সম্পদ

যে, এত সহজে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছ? নাও, এখন একটা কাজ করো। এই আটাটা নিয়ে গিয়ে, গ্রামের সীমারেখায় বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে এসো।" আমি শিরডীবাসীদের প্রশ্ন করলাম, "বাবা এক্ষুনি যা যা করলেন, তার যথার্থ তাৎপর্য্য কি হতে পারে?" তারা আমায় জানালো যে, সেই গ্রামে বিসুচিকার প্রচন্ড প্রকোপ এবং সেটা দূর করার জন্যই বাবার এই উপচার। "এখুনি আপনি যা কিছু গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখলেন, সেটা গম নয় বরং বিসুচিকা, যেটা পিষে নষ্ট করে দেওয়া হল।"

এই ঘটনার পর সত্যি-সত্যি বিসুচিকার সংক্রমণ প্রশমিত হয়ে গেল এবং গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত ও সুখী হল। বলা বাহুল্য, আমার মন আনন্দে মেতে ওঠে। মনে নানারকম কৌতূহল জাগে। আটা ও বিসুচিকা রোগের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে? ঘটনাটি বোধগম্য হচ্ছিল না। এই মধুর লীলার মাহাত্ম্য প্রকাশ না করতে পারলে আমি সন্তুষ্ট হতে পারব না। লীলাটির কথা ভাবতে-ভাবতে আমার মন প্রফুল্লিত হয়ে উঠল এবং এইভাবে বাবার জীবনচরিত লেখার প্রেরণা পেলাম। এই কথা তো সবাই জানে যে, এই কাজটি বাবার কৃপা ও আশীর্বাদের ফলস্বরূপই সফল হয়েছে।

এবার আসি গম পেষার ঘটনাটির তাৎপর্য্যর দিকে। শিরডীবাসীরা এই ঘটনাটির যা অর্থ বুঝল, সেটা প্রায় ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হয়, এছাড়া এর অন্য এক অর্থও আছে। বাবা শিরডীতে **৬০** বছর ছিলেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে উনি এই গম পেষবার কাজটি প্রায় প্রতিদিনই করতেন। গম পেষবার অভিপ্রায় আটা তৈরি না হয়ে বরং নিজের ভক্তদের পাপ, দুর্ভাগ্য, মানসিক ও শারীরিক কষ্ট বিনাশ

করাই ছিল। যাঁতার উপরের পাট হলো ভক্তি, নীচেরটি কর্ম। যাঁতার হাতল (দণ্ড) যেটা ধরে যাঁতা ঘোরাতেন সেটা ছিল জ্ঞান। বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষন মানুষের হৃদয় থেকে প্রবৃত্তি, আসক্তি, ঘৃণা ও অহংকার নির্মূল না হয়ে যায় - যেগুলি নষ্ট হওয়া খুবই দুষ্কর, ততক্ষন জ্ঞান প্রাপ্তি এবং আত্মানুভূতি সম্ভব নয়।

এই ঘটনাটি একটা ঐরকমই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়। কবীর একটি মহিলাকে শষ্যের দানা পিষতে দেখে, নিজের গুরু নিপৎনিরঞ্জনকে বলেন - "আমি কাঁদছি কারণ যেভাবে ঐ দানাগুলি যাঁতাতে পিষে যাচ্ছে, ঠিক সেইরকমই আমিও ভবসাগর রূপী যাঁতায় পিষে যাওয়ার যাতনা অনুভব করছি।" [১] ওঁর গুরু উত্তর দেন- **"ঘাবড়িও না, যাঁতার মাঝখানে জ্ঞান রূপী দন্ড আছে। সেটাকেই ভালভাবে ধরে থাকো, যেভাবে তুমি আমায় ধরে থাকতে দেখো। তার থেকে দূরে যেওনা। শুধু কেন্দ্রের দিকেই অগ্রসর হতে থাকো। এইভাবে তুমি নিশ্চিত ভবসাগর রূপী যাঁতা থেকে বেঁচে যাবে।"**

।। श्री सदगुरु साईं नाथार्पनमस्तु। शुभम् भवतु।

১. চলন্ত যাঁতা দেখে দিল কবির কেঁদে,
দুই পাটের মাঝখানে আস্ত থাকে বলো কে?

অধ্যায় - ২

গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য, কার্য্য শুরু করাতে অসমর্থতা ও সাহস, গম্ভীর তর্ক-বিতর্ক, অর্থপূর্ণ উপাধি 'হেমাডপন্ত', গুরুর প্রয়োজন।

গত অধ্যায়ে গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে, কি কি কারণে তিনি গ্রন্থ রচনার কার্য্য আরম্ভ করার প্রেরণা পান তার আলোচনা করেছেন। এবার তিনি এই গ্রন্থটি পাঠ করার যোগ্য অধিকারী এবং অন্যান্য বিষয়ে এই অধ্যায়ে বিবেচনা করেছেন।

গ্রন্থ লেখার কারণ

বাবা কিভাবে বিসুচিকা রোগের প্রকোপ, আটা পিষে এবং সেটা গ্রামের বাইরে ছড়িয়ে দিয়ে থামান এবং এই রোগ সম্পূর্ণরূপে উন্মূলন করে দেন - এই লীলা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি আরো অনেক লীলা শুনেছি, যেগুলি আমার মনে অফুরন্ত আনন্দ ভরে দেয় এবং এই আনন্দের স্রোতই কাব্য রূপে প্রকাশ হয়েছে। আমার এ কথাও মনে হলো যে, এই মহান ও আশ্চর্য্যজনক লীলার বর্ণনা বাবার ভক্তবৃন্দের জন্য অত্যন্ত মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ হবে। এই লীলামৃত পান করলে তাদের পাপ সমূলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি বাবার পবিত্র জীবনগাথা এবং তাঁর মধুর উপদেশ লিখতে আরম্ভ করলাম। শ্রী সাইয়ের জীবনী যুক্তিসিদ্ধ বা দ্বন্দ্বমূলক, কোনটাই নয়; এটা আমাদের জন্য সত্য ও মহান পথদর্শক। শ্রী হেমাডপন্তের মনে হয় যে, উনি এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত পাত্র নন-"আমি তো নিজের

প্রিয় বন্ধুর জীবনীর সম্বন্ধে ভালভাবে পরিচিত নই আর নাই নিজের প্রকৃতির বিষয়ে, তাহলে আমার মত এক মূঢ় মানুষ একজন এমন মহান সৎপুরুষের জীবনী লেখার দুঃসাহস কি করে করতে পারে? অবতারদের প্রবৃত্তির বিষয় বর্ণনা করতে, বেদও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে। কোন মহাপুরুষের বা সন্তের চরিত্র বোঝার জন্য, সর্বাগ্রে নিজে সন্ত সদৃশ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেই হিসেবে তাঁর লীলার গুণগান করার ক্ষেত্রে, আমি সর্বরূপে অযোগ্য। সাধুপুরুষের জীবনী লেখার জন্য মহান সাহসের দরকার এবং এমন যেন না হয় যে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।" এই আমার একমাত্র সংশয়। তাই শ্রী বাবার কৃপা অর্জন করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করি।

মহারাষ্ট্র প্রান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত শ্রী জ্ঞানেশ্বর বলেছিলেন যে, সন্তচরিত্র যে লেখে, তার প্রতি ভগবান বিশেষ প্রসন্ন হন। ভক্তরা সাধু-সন্তের সেবা করার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন। ওদিকে সন্তরাও কার্য্যটিকে বিচিত্র রূপে করিয়ে নেন। আসল প্রেরণা তো সন্তরাই দেন, ভক্ত তো নিমিত্ত মাত্র বা বলা যেতে পারে যে এক যন্ত্রস্বরূপ। উদাহরণস্বরূপ, কবি মহীপতি সন্ত-চরিত্র লেখার প্রেরণা পান। এই অন্তঃপ্রেরণার ফলেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। ঠিক এইভাবেই, শ্রী দাসগণুর সেবা স্বীকৃত হয়েছিল। মহীপতি চারটি কাব্য রচনা করেন - 'ভক্তবিজয়,' 'সন্তবিজয়,' 'ভক্তলীলামৃত' এবং 'সন্তলীলামৃত।' দাসগণু দুটি কাব্য লেখেন, 'ভক্তলীলামৃত' ও 'সন্তকথামৃত' - যেগুলিতে আধুনিক সন্তদের চরিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে। 'ভক্তলীলামৃত' -তে অধ্যায় **৩১, ৩২ ও ৩৩** ও 'সন্তকথামৃত'-তে অধ্যায় **৫৭**তে শ্রী সাই বাবার মধুর জীবনী ও তাঁর অমৃততুল্য উপদেশ খুবই সুন্দর ও মনোরঞ্জকভাবে

লেখা হয়েছে। এইগুলি শ্রী সাইলীলা পত্রিকার **১১, ১২, ও ১৩** অঙ্কে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দকে এইগুলি পড়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাই। এই রকমই শ্রী সাই বাবার অদ্ভুত লীলার বর্ণনা একটি ছোট্ট পুস্তকে - ('শ্রী সাইনাথ ভজনমালা') বান্দ্রার শ্রীমতি সাবিত্রীবাঈ রঘুনাথ তেন্দুলকর খুবই সুন্দর ভাবে করেছেন।

শ্রী দাসগণু মহারাজও শ্রী সাই বাবার মহিমার বিষয়ে অনেক মধুর কবিতা রচনা করেছেন। আরেক ভক্ত, শ্রী অমীদাস ভবানী মেহতাও বাবার কিছু কথা-কাহিনী গুজরাতীতে প্রকাশিত করেছেন। 'সাইপ্রভা' নামক পত্রিকাতেও, কিছু লীলা শিরডীর সংস্থান দ্বারা প্রকাশিত করা হয়েছে। এবার একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে যে, যখন শ্রীসাইনাথ মহারাজের জীবনের উপর আলোকপাত করার জন্য এত সাহিত্য রয়েছে, তখন আরেকটি গ্রন্থ, 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' রচনা করার আবশ্যকতাটাই বা কি? এর উত্তরে শুধু এই বলা যেতে পারে যে, শ্রী সাইবাবার জীবনী মহাসাগরের ন্যায় অগাধ ও বিস্তৃত। যদি এর গভীরে ডুব দেওয়া হয়, তাহলে জ্ঞান ও ভক্তি রূপী অমূল্য রত্ন সহজেই পাওয়া যাবে। শ্রী সাইবাবার জীবনী, তাঁর দৃষ্টান্ত ও উপদেশ মহান ও আশ্চর্য্যজনক। দুঃখী ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত জন এর দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখ এবং শান্তি পাবে **যদি শ্রী সাইবাবার উপদেশগুলি (যেগুলি বৈদিক শিক্ষার ন্যায় মনোরঞ্জক ও শিক্ষাপ্রদ) মন দিয়ে শ্রবণ ও মনন করা হয়, তাহলে ভক্তরা সহজেই নিজেদের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত করতে পারবেন,** অথবা ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা, অষ্টাঙ্গ যোগের সিদ্ধি, ধ্যানের মধ্যে আনন্দ ইত্যাদির প্রাপ্তি বড় সহজেই হয়ে যাবে। এই সব কথা চিন্তা করে, আমি চরিত্রের কথাগুলি সংকলন করতে আরম্ভ

করে দিই। সাথে-সাথে এটাও মনে হয় যে, আমার জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাধনাও এইটিই। যে সরল সহজ জন বাবার দর্শন দ্বারা নিজেদের দৃষ্টি ধন্য করার সৌভাগ্য পায়নি, তাদের জন্য এই চরিত্র অত্যন্ত আনন্দদায়ক হবে।

অতএব আমি নিজের অহংকার তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করে দিলাম। আমার মনে হল, এর পর আমার পথ খুবই সহজ হয়ে গেছে এবং বাবাই আমায় ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করবেন। কিন্তু গ্রন্থ লেখার বিষয়ে, বাবার অনুমতি নিতে সাহস হচ্ছিল না। অতএব আমি মাধবরাওকে (উপনাম শামা), যাঁকে বাবার অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে অগ্রণী মানা হয়, এই কাজের ভার দিই। তিনি আমার হয়ে বাবার কাছে অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। উনি বাবার কাছে বিনম্র ভাবে প্রার্থনা করে বলেন- "এই আন্নাসাহেব আপনার জীবনী লিখবার জন্য অতি উৎসুক। তাই আপনি কিন্তু দয়া করে বলবেন না যে, আমি তো এক ফকির, আমার জীবনী লিখবার দরকারটাই বা কি? একমাত্র আপনার কৃপা ও আজ্ঞার আশীর্বাদ পেলেই, ইনি সেটা লিখতে পারবেন। আপনার শ্রীচরণের পুণ্যপ্রতাপই এই কার্য্যটিকে সম্পূর্ণ রূপে সফল করবে। আপনার অনুমতি বা আশীর্বাদের অভাবে কোন কাজই যশস্বী হতে পারে না।" এরকম প্রার্থনা শুনে বাবার দয়া হয়। তিনি আমায় উদী দিয়ে, নিজের বরদহস্ত আমার মাথায় রেখে আশীস দিয়ে বললেন- "এঁকে জীবনী ও দৃষ্টান্তগুলি একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করতে দাও, আমি এঁকে সাহায্য করব। **আমি স্বয়ং নিজের জীবনী লিখে, ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করব।** কিন্তু এঁর নিজের অহংকার ত্যাগ করে, আমার শরণ গ্রহণ করা উচিত। যে নিজের জীবনে এইরূপ আচরণ

করে, তাকে আমি অত্যাধিক সাহায্য করি। যখন এঁর অহং সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং লেশমাত্র পাওয়া যাবে না, তখন **আমি এঁর অন্তঃকরণে প্রকট হয়ে, নিজের জীবনী লিখব। আমার চরিত্র এবং উপদেশগুলি শ্রবণ করামাত্র, ভক্তের হৃদয়ে শ্রদ্ধা জেগে উঠবে এবং সহজেই আত্মানুভূতি ও পরমানন্দ পাবে।** গ্রন্থে নিজের মতের সমর্থনে এবং অন্যদের মতকে খন্ডন করার জন্য তথা অন্য কোন বিষয়ের পক্ষপাত করা বা ব্যর্থ বাদবিবাদের কুচেষ্টা যেন না থাকে।"

অর্থপূর্ণ উপাধি 'হেমাডপন্ত'

'বাদ-বিবাদ' শব্দটা লিখতেই মনে পড়ল যে, আমি পাঠকগণকে কথা দিয়েছি, 'হেমাডপন্ত' উপাধিটি আমি কি করে পেলাম, সেটা বর্ণনা করব। এবার আমি সেটাই বিস্তারিত ভাবে লিখছি।

শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত ও নানাসাহেব চাঁদোরকরকে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে গন্য করা হয়। ওঁরাই আমাকে শিরডী গিয়ে শ্রী সাইবাবার দর্শন করতে অনুরোধ করেন। আমিও তাঁদের কথা দিই, কিন্তু নানারকম বাধা পাওয়ায়, আমার শিরডী যাত্রা স্থগিত হয়ে যায়। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে, লোনাওয়ালায় অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওঁরা যথাসাধ্য সব রকমের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করান, কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হয়, ওর জ্বর কিছুতেই কমে না। শেষে ওঁরা নিজেদের গুরুদেবকে ছেলের মাথার কাছে বসান, কিন্তু পরিণাম যে কে সেই থাকে। এই ঘটনাটি দেখে আমার মনে হয় যে, যদি গুরু একটি ছেলের প্রাণও রক্ষা না করতে পারেন, তাহলে তাঁর উপযোগিতাই বা কি? এবং যখন তাঁর মধ্যে কোন সামর্থই

নেই, তখন আর শিরডী যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন? এই ভেবে আমি শিরডী যাওয়া স্থগিত করে দিই। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হবেই। প্রান্তাধিকারী নানাসাহেব চাঁদোরকর বসই ট্যুরে যাচ্ছিলেন। উনি ঠানে থেকে দাদার পৌঁছন এবং বসই যাওয়ার গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময় বান্দ্রা লোকাল এসে পৌঁছয়, যাতে চড়ে উনি বান্দ্রা পৌঁছান এবং শিরডী যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য আমায় বকুনি দেন। নানা সাহেবের বক্তব্য আমার মনে ধরে। ফলতঃ সেই রাতেই শিরডী রওনা হওয়া স্থির করি। আমি সোজা দাদার গিয়ে ওখান থেকে মনমাডের ট্রেন ধরব ভেবেছিলাম। এই ভেবে আমি দাদারের ট্রেনে গিয়ে উঠলাম। ট্রেন ছাড়বে, এমন সময় একজন মুসলমান আমার কম্পার্টমেন্টে ঢোকে ও আমার জিনিষপত্র দেখে আমার গন্তব্যস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। আমিও তাকে নিজের যাত্রার বিষয় সব খুলে বলি। তখন সে আমায় জানায় যে, মনমাডের গাড়ী দাদার স্টেশনে দাঁড়ায় না, অতএব সোজা 'বোরীবন্দর' যাওয়া উচিত। এই ঘটনাটি যদি না ঘটত, তাহলে হয়তো পরের দিন শিরডী না পৌঁছাতে পারার জন্য নানারকমের কুশঙ্কা দ্বারা আক্রান্ত হতে হতো। কিন্তু তা হল না। ভাগ্যক্রমে পরের দিন সকাল নটা নাগাদ শিরডী পৌঁছলাম। এই ঘটনাটি **১৯১০** সালে ঘটে যখন, প্রবাসী ভক্তদের থাকার জন্য 'সাঠে ওয়াড়া'-ই একমাত্র স্থান ছিল। টাঙ্গা থেকে নেমেই, আমি শ্রী সাইবাবার দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। ঠিক সেই সময় ভক্ত প্রবর শ্রী তাত্য়া সাহেব নুলকর মস্‌জিদ থেকে ফিরছিলেন। উনি আমায় জানালেন- 'এই সময় বাবা মস্‌জিদের মোড়েই আছেন। এখন প্রারম্ভিক দর্শন বা 'ধূলি ভেট' করে নাও, তারপর স্নানাদি সেরে দর্শন কোরো।" একথা শোনামাত্র, আমি দৌড়ে গিয়ে বাবার দর্শন করে, তাঁর চরণ বন্দনা করি। আমার আনন্দের

সীমা রইল না। মনে হচ্ছিল যেন, আমি কি না কি পেয়ে গেছি। আমার শরীর উল্লসিত হয়ে ওঠে। ক্ষিধে বা তেষ্টার কোন বোধই রইল না। যে মুহূর্তে তাঁর ভববন্ধন বিনাশকারী চরণের স্পর্শ পেলাম, তখন থেকেই আমার জীবনে এক নতুন আনন্দ প্রবাহিত হতে শুরু হয়। সে কথা জীবনে কখনো ভুলতে পারব না। আমি সর্বদা তাঁকে স্মরণ করে মনে মনে প্রণাম করি। আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে, সাই দর্শনের এক বৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেটা হচ্ছে এই যে, তাঁর দর্শনের ফলস্বরূপ বিচার পরিবর্তন হয়- বিগত কর্মের প্রভাব ক্ষীন হয়ে যায় এবং ধীরে-ধীরে অনাসক্তি ও সাংসারিক ভোগের প্রতি বৈরাগ্য বাড়তে থাকে। শুধু গত জন্মের অনেক শুভ সংস্কারের ফলেই এইরকম দর্শন পাওয়া সম্ভব। পাঠকগণ, আমি আপনাদের শপথ করে বলতে পারি যে, যদি আপনারা সাই বাবাকে এক পলক দেখেন, তাহলে সমগ্র বিশ্বই আপনাদের সাইময় মনে হবে।

তুমুল তর্ক

শিরডী পৌঁছে প্রথম দিনই, বালাসাহেবের সাথে গুরুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তর্ক বেঁধে যায়। আমার মতে, নিজের স্বাধীনতা ছেড়ে, কারো পরাধীন কেনই বা হওয়া এবং যখন কর্ম করতেই হয়, তখন গুরুর কিই বা প্রয়োজন? প্রত্যেককে নিজের চেষ্টার ওপর নির্ভর করে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত। গুরু শিষ্যের জন্য করেনই বা কি? তিনি তো সুখ-নিদ্রার আনন্দ নেন। এইভাবে আমি স্বতন্ত্র থাকার পক্ষ নিই এবং বালাসাহেব প্রারব্ধের। তিনি বললেন- 'যা ভাগ্যে লেখা আছে, সেটা তো ঘটবেই - সেটা উচ্চশ্রেণীর মহাপুরুষও বদলাতে অসফল হয়ে যান। কথায় বলে- ভাবি এক, হয় আরেক।

তারপর পরামর্শের সুরে বললেন- "ভাই, তোমার এই বিদ্যে-বুদ্ধি ছেড়ে দাও। এইরকম অহংকার তোমায় কোনভাবে সাহায্য করবে না।" দুপক্ষের এরকম তর্কা-তর্কিতে প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। শেষে নিরুপায় হয়ে বিবাদ স্থগিত করতে হলো। কিন্তু এর ফলে আমার মানসিক শান্তি নষ্ট হয়ে গেলো এবং আমি এটাই অনুভব করলাম যে, যতক্ষন গভীর দেহচেতনার আবরণে থাকা হয়, ততক্ষনই এরকম অহংকার ও বিবাদ সম্ভব। বস্তুতঃ সব বিবাদের জড়ই হচ্ছে, এই অহংকার। এরপর অন্যান্যদের সাথে যখন মস্‌জিদ পৌঁছাই, তখন বাবা হঠাৎ কাকা সাহেব দীক্ষিতকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেন- "সাঠে-ওয়াড়ায় কি চলছিল? কি বিষয়ে তর্ক হচ্ছিল?" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন- "এই হেমাডপন্ত কি বলছিলেন?" এ কথাটি শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সাঠে-ওয়াড়া এবং মস্‌জিদের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব আছে। সর্বজ্ঞ বা অন্তর্যামী না হলে, বাবা তর্কের কথা কি করে জানতে পারলেন?

আমার বার-বার মনে হচ্ছিল বাবা আমায় 'হেমাডপন্ত' নামে কেন সম্বোধন করলেন? এই শব্দটি তো 'হেমাদ্রিপন্ত'-য়ের অপভ্রংশ। হেমাদ্রিপন্ত দেবগিরির যাদব রাজবংশের মহারাজা মহাদেব ও রামদেবের বিখ্যাত মন্ত্রী ছিলেন। উনি বিরাট বিদ্বান এবং সুন্দর স্বভাবের লোক ছিলেন। 'চতুর্বর্গ চিন্তামণি' (যাতে আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা আছে) এবং 'রাজ প্রশান্তি'-র মতন অতি চমৎকার কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ ছাড়াও, হিসেব রাখার এক নতুন নিয়মের ও "মোদী-লিপিমালার (মারাঠী সর্ট হ্যাণ্ড) তিনিই জন্মদাতা। সে জায়গায় কোথায় আমি এক অজ্ঞানী, মূর্খ ও অল্পবুদ্ধি মানুষ। তাই বুঝতে পারছিলাম না যে, আমাকে এই বিশেষ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করার

তাৎপর্য্য কি হতে পারে? গভীর বিশ্লেষণের পর মনে হলো যে, বোধহয় আমার অহংকার চূর্ণ করার জন্যই বাবা এই অস্ত্রটি ব্যবহার করলেন- ভবিষ্যতে যাতে আমি সব সময়েই নিরাভিমানী ও বিনম্র হয়ে থাকি। কিংবা এটা কি আমার বাক্‌চাতুর্য্যের প্রশংসা? ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টিপাত করলে বোধ হয় যে, বাবারদ্বারা 'হেমাডপন্ত' উপাধিটি দেওয়া অদ্ভুত ভবিষ্যবাণী ছিল। (সবাই জানে যে কালান্তরে, দাভোলকর শ্রী সাই বাবা সংস্থানের পরিচালনা অত্যন্ত বিলক্ষণ ভাবে করে গেছেন এবং তার সাথে-সাথে মহাকাব্য 'শ্রী সাই সৎচরিত্র' রচনা করেন। এই গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলির, যেমন- জ্ঞান, বৈরাগ্য, শরণাগতি ও আত্মনিবেদন ইত্যাদির আলোচনা পাওয়া যায়।)

গুরুর প্রয়োজনীয়তা ঃ-

এ বিষয়ে বাবার কি মত ছিল, তার উপর হেমাডপন্তদ্বারা লিখিত কোন লেখন বা স্মৃতি পত্র নেই। কিন্তু কাকাসাহেব দীক্ষিত এই বিষয় একটি লেখন প্রকাশ করেছেন। বাবার সাথে সাক্ষাৎ করার পরের দিন, 'হেমাডপন্ত' এবং কাকাসাহেব বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে মস্‌জিদে গেলেন। বাবাও স্বীকৃতি দিয়ে দেন। কেউ প্রশ্ন করল - "বাবা, কোথায় যাই?" উত্তর এলো - "উপরে যাও।"

প্রশ্ন - "পথ কেমন?"

বাবা - অনেক পথ আছে। একটা পথ এখান থেকেও হয়ে যায়। কিন্তু এই পথ খুবই দুর্গম ও জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণের ভয়ও আছে।

কাকাসাহেব - যদি পথ প্রদর্শক সঙ্গে থাকে, তাহলে?

বাবা - তাহলে কোন কষ্ট হবে না। সে তোমায় শেয়াল-কুকুর থেকে রক্ষা করে, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে জঙ্গলে পথ ভুলে যাওয়ার বা গর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই বার্তালাপের সময় দাভোলকর সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। উনি ভাবলেন যে যা কিছু বাবা বলছেন সেটা ওঁরই প্রশ্নের উত্তর যে গুরুর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? উনি মনোস্থির করে নেন যে, স্বাধীন বা পরাধীন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কিরূপ সফল হয়, এই বিষয়ে আর কোনদিন বাদ-বিবাদ করবেন না। বরং পরমার্থ লাভের জন্য গুরুর উপদেশ পালন করাই একমাত্র পথ। এই উপদেশগুলির বর্ণনা মূল গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে করা হয়েছে, যাতে লেখা আছে যে শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ, মহান অবতার হওয়া সত্ত্বেও, আত্মানুভূতির জন্য, শ্রীরামকে গুরু বশিষ্ঠর ও শ্রীকৃষ্ণকে গুরু সন্দীপনীর শরণে যেতে হয়েছিল। এই পথে উন্নতির জন্য শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য - এই দুটি গুণের আশ্রয় নিতে হয়।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৩

শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি, আদেশ ও প্রতিজ্ঞা, ভক্তদের দ্বারা সমর্পণ, বাবার লীলা আলোকস্তম্ভ স্বরূপ, মাতৃপ্রেম, রোহিলার কাহিনী, বাবার মধুর অমৃতোপদেশ।

শ্রী সাইবাবার স্বীকৃতি ও আশ্বাস

গত অধ্যায়ে আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে বাবা সচ্চরিত্র লেখার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন- "এই গ্রন্থটি লেখাতে আমার পুরোপুরি মত আছে। তুমি নিজের মন স্থির করে, আমার কথায় বিশ্বাস রাখো এবং নির্ভয়ে কর্তব্য পালন করতে থাকো। যদি আমার লীলাগুলি লেখা হয়, তাহলে অবিদ্যার নাশ হবে এবং মন ও ভক্তি দিয়ে শ্রবণ করলে, দেহচেতনা নষ্ট হয়ে ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হবে। যারা এই লীলাগুলির বেশী গভীরে গিয়ে খোঁজ করবে, তারা অনায়াসেই জ্ঞানরূপী অমূল্য রত্ন আহরণ করবে।"

এই কথাগুলো শুনে, হেমাডপন্তের খুব আনন্দ হলো এবং উনি নির্ভয় হয়ে গেলেন। ওঁর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে উঠল যে, এবার তাঁর কাজটি অবশ্যই সফল হবে। বাবা শামার দিকে তাকিয়ে বলেন- "যে ভালোবেসে আমার নাম স্মরণ করবে, আমি তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে দেব। ওর ভক্তি দিনের-পর-দিন বাড়বে। যে আমার চরিত্র এবং কীর্তির শ্রদ্ধাপূর্বক গুণগান করবে, তাকে আমি সর্বদা সবরকম ভাবে সাহায্য করব। **বলা বাহুল্য, যে ভক্তরা আমাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তারা আমার লীলা শ্রবণ করে**

খুবই আনন্দিত হয়। বিশ্বাস রেখো, যে কেউই আমার লীলা কীর্তন করবে, সে নিশ্চয় পরমানন্দ ও চিরসন্তোষ লাভ করবে। এটা আমার বৈশিষ্ট্য যে, যে অনন্যচিত্তে আমার শরণ নেয়, শ্রদ্ধাপূর্বক আমার পূজন, নিরন্তর স্মরণ এবং আমারই ধ্যান করে, তাকে আমি মুক্তি প্রদান করি।"

"যে নিত্য নিরন্তর আমার নাম স্মরণ ও পুজো করে, আমার লীলাগুলি প্রেমপূর্বক মনন করে - এই ধরণের ভক্তদের মধ্যে সাংসারিক বাসনা ও অজ্ঞানরূপী প্রবৃত্তিগুলি কি করে থাকতে পারে? আমি তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিই।"

"আমার কথা শ্রবণ করলে, মুক্তি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং আমার কথাগুলি শ্রদ্ধাপূর্বক শোন ও মনন করো। সুখ ও শান্তি প্রাপ্তির জন্য এটাই এক সরল পথ। এর দ্বারা শ্রোতাদের মনে শান্তি আসবে এবং যখন ধ্যান প্রগাঢ় ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন অখন্ড চৈতন্যধনের সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত হবে। কেবল 'সাই', 'সাই' উচ্চারণ দ্বারাই, তাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে।"

ভক্তদের বিভিন্ন কার্য্যের প্রেরণা

ভগবান নিজের কোন ভক্তকে মন্দির-মঠ তো কাউকে নদীতীরে ঘাট তৈরী করার, কাউকে তীর্থ পর্য্যটন করার এবং কাউকে ভগবৎ কীর্তন করার - এরকম আলাদা-আলাদা কার্য্যের প্রেরণা দেন।

এইভাবে আমাকেও 'শ্রীসাই সৎচরিত্র' লেখার প্রেরণা তিনিই দেন। কোন বিদ্যারই সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকায়, আমার নিজেকে এই ব্যাপারে সবরকম ভাবে অযোগ্য মনে হচ্ছিল। অতএব এই দুষ্কর কার্য্য করার দুঃসাহস কেনই বা করা উচিত? শ্রী সাই মহারাজের যথার্থ জীবনীর বর্ণনা করার সামর্থ কার আছে? শুধু তাঁর কৃপায় এই কাজ সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেইজন্য আমি যখন লেখা শুরু করি, **বাবা আমার অহং-বুদ্ধি নষ্ট করে দেন এবং তিনি স্বয়ং নিজের চরিত্র রচনা করেন। অতএব এই চরিত্রের কৃতিত্ব তাঁর, আমার নয়।** জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও আমি দিব্যচক্ষুবিহীন ছিলাম, অতএব 'সাই সৎচরিত্র' লিখবার ক্ষেত্রে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু শ্রীহরির কৃপায় কিই বা অসম্ভব? মূকও বাচাল হয়ে যায় ও পঙ্গুও পাহাড় অতিক্রম করে। নিজের ইচ্ছেমত কাজ সম্পূর্ণ করিয়ে নেওয়ার উপায় তিনিই জানেন। হারমোনিয়াম বা বাঁশি কেমন করে আভাস পাবে যে ধ্বনি কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। এই কথা তো শুধু বাদকই জানে। চন্দ্রকান্তমনির সৃষ্টি এবং সমুদ্রের কল্লোল এই দুয়ের কোনটারই কারণ তারা নিজেরা নয়; কারণ নিহিত রয়েছে চন্দ্রোদয়ের মধ্যে।

বাবার চরিত্র আলোকস্তম্ভ স্বরূপ

সমুদ্রতটে অনেক স্থানে আলোকস্তম্ভ নাবিককে দুর্ঘটনা থেকে ও জাহাজকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য বানানো হয়। এই ভবসাগরে 'শ্রী সাইবাবার সৎচরিত' এর উপযোগিতা ঠিক সেরকমই। এটি অমৃত থেকেও বেশী মধুর ও সাংসারিক পথটিকে সহজ করে তোলে। যখন এটি কানের মাধ্যমে হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন দেহচেতন

নষ্ট হয়ে যায় ও হৃদয়ে একত্রিত করলে সমস্ত কুশঙ্কা লোপ পায়। অহংকারের বিনাশ হয় ও অজ্ঞানতার আবরণ লুপ্ত হয়ে জ্ঞান প্রকট হয়। **বাবার বিশুদ্ধ কীর্তির বর্ণনা নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করলে ভক্তদের পাপ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব এইটি মোক্ষ প্রাপ্তিরও সরল উপায়।** সত্যযুগে শম-দম, ত্রেতাতে ত্যাগ, দ্বাপরে পূজো ও কলিযুগে ভগবৎ কীর্তনই মুক্তির উপায়। এই শেষ সাধনাটি সকল (চারবর্ণের) লোকেদের জন্য সাধ্য। অন্যান্য সাধনা যেমন যোগ, ত্যাগ, ধ্যান ইত্যাদি করা একটু কঠিন, কিন্তু চরিত্র ও হরিকীর্তন শ্রবণ করা অত্যন্তই সুলভ। শ্রবণ এবং কীর্তন দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং ভক্ত বাসনা-রহিত হয়ে আত্মজ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়। এই ফল প্রদান করার জন্যই বাবা এই 'সৎচরিত্র'-এর (গ্রন্থটি) রচনা করালেন। ভক্তগণ এবার সহজেই সাইচরিত্র অবলোকন করুন এবং তার সাথে-সাথে তাঁর মনোহর স্বরূপ ধ্যান করে, গুরু এবং ভগবদ্ ভক্তির অধিকারী হয়ে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করুন। 'শ্রীসাই সৎচরিত্র' সফল ভাবে সম্পূর্ণ হওয়াটা সাই মহিমাই জানবেন, আমরা তো শুধু নিমিত্তমাত্র।

মাতৃপ্রেম

গরু নিজের বাছুরকে কিভাবে প্রেম করে, সেটা সবাই জানে। ওর স্তন সর্বদাই দুধে ভরা থাকে এবং যখন ক্ষিধের চোটে বাছুর স্তনের দিকে ছুটে আসে, তখন দুধের ধারা আপনা-আপনি প্রবাহিত হতে থাকে। ঠিক এইভাবেই মাও নিজের সন্তানের প্রয়োজন আগে থেকেই খেয়াল রাখেন এবং ঠিক সময় স্তনপান করান। সন্তানের রূপ-সজ্জা দেখে, মায়ের মনে আনন্দের সীমা থাকে না। মায়ের প্রেম

বিচিত্র, অসাধারণ ও নিঃস্বার্থ - তার কোন উপমা দেওয়া যায় না। শিষ্যের প্রতি সদ্‌গুরুর প্রেম ঠিক এই রকমই এবং বাবারও আমার প্রতি এরকমই প্রেম ছিল। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করছিঃ-

১৯১৬ সালে আমি চাকরী থেকে অবকাশ গ্রহণ করি। যা পেনশন আমি পেতাম, তা দিয়ে, পুরো পরিবারের ভরণপোষণ একটু কঠিন মনে হচ্ছিল। সেই বছর গুরু পূর্ণিমার দিন, আমিও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে শিরডীতেই ছিলাম। বাবার এক ভক্ত আন্না চিঞ্চনীকর নিজে-নিজেই বাবার কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করেন - " এর উপর কৃপা করুন। যা পেনশন ইনি পান, তা জীবন নির্বাহযোগ্য নয়। কুটুম্ব বৃদ্ধি হচ্ছে। দয়া করে আরেকটি চাকরী পাইয়ে দিন, যাতে এঁর চিন্তা দূর হয়।" বাবা উত্তর দেন - "ইনি চাকরী পেয়ে যাবেন কিন্তু এঁকে আমার সেবাতেই রত হয়ে আনন্দ অনুভব করা উচিত। এঁর ইচ্ছে সর্বদা পূরণ হবে। **সম্পূর্ণ মনযোগ আমার দিকে দিয়ে অধার্মিক ও দুর্জন থেকে দূরে থাকা উচিত।** এঁকে সবার সঙ্গে দয়াপূর্ণ ও নম্র ব্যবহার করা উচিত ও অন্তঃকরণে আমারই উপাসনা করা উচিত। যদি ইনি এইরূপ আচরণ করতে পারেন, তাহলে নিত্যানন্দের অধিকারী হয়ে যাবেন।"

রোহিলার কাহিনী

এই কাহিনীটি এই সত্যের প্রমাণ দেয় যে, শ্রী সাইবাবা সমস্ত প্রাণীদের সমানরূপে ভালবাসতেন। এক সময় রোহিলা নামক এক ব্যক্তি শিরডীতে থাকতে এলো। তার শরীর লম্বা-চওড়া, সুদৃঢ় ও সুগঠিত। বাবার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ও শিরডীতেই থাকতে লাগল। সে

অষ্টপ্রহর উচ্চস্বরে 'কল্‌মা' (কোরানের শ্লোক) পাঠ করত এবং 'আল্লা হো আকবর' এর ডাক আওড়াতো। শিরডীর অধিকাংশ বাসিন্দারা সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে, যখন রাতে বাড়ী ফিরত, তখন রোহিলার কর্কশ আওয়াজ তাদের আরাম ও শান্তি ভঙ্গ করত। রাতে ঘুমোতে না পারার দরুণ তারা যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধে অনুভব করছিল। অনেকদিন ওরা এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না। কিন্তু কষ্ট অসহ্য হয়ে উঠলে ওরা বাবার কাছে রোহিলাকে এই উৎপাত বন্ধ করতে বলার জন্য প্রার্থনা জানাতে গেল। কিন্তু বাবা তাদের এই প্রার্থনা গ্রাহ্যই করলেন না, বরং গ্রামবাসীদেরই শাসন করে বললেন যে, তাদের নিজের কাজের প্রতি মন দেওয়া উচিত, রোহিলার দিকে নয়। বাবা তাদের জানালেন যে, রোহিলার স্ত্রী খুব বাজে এবং সে রোহিলা ও বাবাকে যথেষ্ট কষ্ট দেয়। কিন্তু কোরাণ শরীফের কল্‌মার সামনে, সে টিঁকতে সাহস করে না। তবে গিয়ে দুজনে একটু শান্তিতে ও সুখে থাকতে পারে। কিন্তু আসলে রোহিলার কোন স্ত্রী ছিল না। বাবা শুধু কুবিচারের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে, বাবা প্রার্থনা এবং ঈশ্বর উপাসনাকে বেশী প্রাধান্য দিতেন। সুতরাং তিনি রোহিলার পক্ষ নিয়ে গ্রামবাসীদের শান্তিপূর্বক কিছুদিন উৎপাত সহ্য করতে পরামর্শ দেন।

বাবার মধুর অমৃতোপদেশ

একদিন মধ্যাহ্ন আরতির পর, ভক্তরা যখন নিজেদের বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল, সেই সময় বাবা নীচের অতি সুন্দর উপদেশটি দেন -

"তুমি যেখানে খুশি সেখানে থাকো, যা ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু সব সময় মনে রেখো যে, তুমি যাই করো আমি সব জানতে পারি।

আমিই সমস্ত প্রাণীর প্রভু এবং সর্বস্থানে ব্যাপ্ত। আমারই উদরে সমস্ত জড় ও চেতন প্রাণীর উদ্ভব। আমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা এবং সঞ্চালক। আমিই উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকর্তা। যারা আমায় ভক্তি করে, তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারে না। আমার ধ্যান যারা উপেক্ষা করে, তারা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমস্ত জন্তু, জীব এবং দৃশ্যমান, পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী বিশ্ব আমারই স্বরূপ।' এই সুন্দর ও অমূল্য উপদেশ শুনে আমি তৎক্ষনাৎ দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম যে, এরপর ভবিষ্যতে নিজের গুরু ছাড়া অন্য কোন মানুষের সেবা করব না। "তুই চাকরী পেয়ে যাবি" - বাবার এই কথাটা আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমার মনে হতো- "সত্যি-সত্যি কি এমনটি হবে?" কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি প্রমান করলো যে, বাবার কথা ধ্রুব সত্য। আমি কিছুদিনের জন্য আরেকটা চাকরী পাই। তারপর স্বচ্ছন্দে, একাগ্রচিত্তে শেষ জীবন অবধি, বাবার সেবা করি।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে, আমি পাঠকদের কাছে বিনম্র নিবেদন করছি যে, তাঁরা সমস্ত বাধা যেমন- আলস্য, নিদ্রা, মনের চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়-আসক্তি, দূর করে নিজেদের মন বাবার লীলাগুলির দিকে দিন। অন্যান্য সাধনায় শ্রম ও সময় নষ্ট না করে সরল প্রেম দিয়ে এগিয়ে ভক্তি রহস্য জানুন। **ওঁদের শুধু একটাই সহজ উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং সেটা হলো শ্রীসাই লীলা শ্রবণ।** এর দ্বারা অজ্ঞানতার অবসান হয়ে মুক্তির দ্বার খুলে যাবে। অনেক স্থান ভ্রমণ করার সময় লোভী পুরুষ যেমন নিজের লুকানো ধনের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকে, ঠিক সেই রকমই, শ্রী

সাইকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করুন। পরের অধ্যায়ে শ্রী সাইয়ের শিরডী আগমনের বিষয়ে বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৪

শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন, সন্তদের অবতার কার্য্য, পবিত্র তীর্থ শিরডী, শ্রী সাইবাবার ব্যক্তিত্ব, গৌলী বুয়ার অভিজ্ঞতা, শ্রী বিট্‌ঠলের আবির্ভাব, ক্ষীরসাগরের কথা, দাসগণুর প্রয়াগ স্নান, তিনটি 'ওয়াড়া'।

সন্তদের অবতার ক্রীড়া (লীলা)

ভগবদ্‌গীতায় (চতুর্থ অধ্যায় **৭-৮**) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যে-যে কালে ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, সে-সে সময় আমি অবতার ধারণ করি। ধর্মস্থাপন, দুষ্টজনের বিনাশ এবং সাধুজনদের পরিত্রাণের জন্য আমি যুগে-যুগে জন্ম নিই।" সাধু-সন্ত ভগবানেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। তাঁরা উপযুক্ত সময়ে আবির্ভূত হয়ে নিজেদের অবতার কার্য্য পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নিজেদের কর্তব্যের প্রতি বিমুখ হয়ে যায়; যখন শুদ্র উচ্চ জাতির লোকেদের অধিকার কাড়তে শুরু করে; যখন ধর্মের আচার্য্যদের অনাদর ও নিন্দা হয়; যখন লোকজন নিষিদ্ধ ভোজ্য পদার্থ ও মদ্যপান করতে শুরু করে ও ধর্মের আড়ালে নিন্দিত কার্য্য স্থান পায়; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন পরস্পর দ্বন্দ্বে মেতে ওঠে; যখন ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাদি কর্ম ছেড়ে দেয়, কর্মঠ পুরুষদের ধার্মিক কার্য্যে অরুচি উৎপন্ন হয়ে যায়; যখন যোগীগণ ধ্যানাদি কর্ম করা ছেড়ে দেন এবং যখন জনসাধারণের এই ধারণা হয়ে যায় যে, **শুধু ধন, সন্তান এবং স্ত্রীই সর্বস্ব এবং এইভাবে লোকেরা সত্যের পথ হতে বিচলিত**

হয়ে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে; তখন সন্তগণ আবির্ভূত হয়ে নিজেদের উপদেশ এবং আচরণ দ্বারা ধর্মের সংস্থাপনা করেন। তাঁরা সমুদ্রে আলোকস্তম্ভের ন্যায় আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন এবং সত্যের পথে চলতে প্রেরণা দেন। এই ভাবে বহু মহামানব যেমন- নিবৃত্তিনাথ, তুকারাম, নরহরি, নরসীভাই, সঞ্জন কসাই, রামদাস এবং অন্যান্য অনেকে সত্যের পথের দিগ্‌দর্শন করাবার জন্য বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সর্বশেষে শিরডীতে শ্রী সাইবাবার অবতার লীলা ঘটে।

পবিত্র তীর্থ শিরডী

আহমদনগর জেলার গোদাবরীর তীর খুবই ভাগ্যবতী। এখানে অনেক সন্তরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং অনেকে আশ্রয় পেয়েছেন। এই ধরনের সন্তদের তালিকায় শ্রী জ্ঞানেশ্বর মহারাজ প্রধান। শিরডী, আহমদনগর জেলার কোপরগ্রাম তালুকে পড়ে। গোদাবরী নদী পার করে রাস্তা সোজা শিরডী যায়। আট মাইল চলার পর নিমগ্রাম পৌঁছতেই শিরডী দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণা নদীর তীরে অন্যান্য তীর্থস্থান যেমন- গঙ্গাপুর, নরসিংহবাড়ী এবং ঔদুম্বরের মত শিরডীও এক প্রসিদ্ধ তীর্থ। যেমন দামোজী মঙ্গলবেড়াকে, রামদাস সজ্জনগরকে, দত্তাবতার নরসিংহ সরস্বতীওয়াড়ীকে পবিত্র করেছিলেন, ঠিক সেই রকমই, শ্রী সাইনাথ শিরডীতে অবতীর্ণ হয়ে, এই স্থানটিকে ধন্য করেন। শ্রী সাইবাবার সান্নিধ্যে শিরডীর মাহাত্ম্য বিশেষ বেড়ে যায়। এবার আমরা তাঁর চরিত্রের দিকে আসব। তিনি এই ভবসাগর জয় করে নিয়েছিলেন, যেটি পার করা অত্যন্ত দুষ্কর ও কঠিন। শান্তি তাঁর আভূষণ ছিল এবং তিনি ছিলেন জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। বৈষ্ণব

ভক্তরা সর্বদাই তাঁর চরণে আশ্রয় পেতো। দানবীরদের মধ্যে রাজা কর্ণের মত দানী ছিলেন। ঐহিক পদার্থর প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অরুচি বোধ হত। সর্বক্ষণ আত্মস্বরূপেই নিমগ্ন থাকা তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। অনিত্য বস্তুর আকর্ষণ তাঁকে ছুঁতে পারত না। তাঁর মন দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ছিল। তাঁর শ্রীমুখ থেকে সর্বদাই অমৃত ঝরত। তিনি কখনো গরীব ও ধনীর মধ্যে পার্থক্য করেননি। মান-অপমানের বিষয়েও কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা করতেন না- নির্ভয়ে সম্ভাষণ করতেন। বিভিন্ন প্রকারের লোকেদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন, নর্তকীদের অভিনয় এবং নৃত্য দেখতেন ও 'গজল'-কাওয়ালীও শুনতেন। এসবের মাঝেও তাঁর সমাধি (ধ্যান) কিঞ্চিৎমাত্রও ভঙ্গ হত না। 'আল্লা'-র নাম সব সময় ওঁর জিভে ঘুরে বেড়াত। জগৎ ঘুমোলে তিনি জাগতেন এবং জগৎ জাগলে তিনি ঘুমোতেন। এর ব্যাখ্যা ভগবদগীতার হিসেবে বলা যেতে পারে যে, যে বিষয়ে জগতের লোক লালয়িত বা সজাগ থাকে সে সব বিষয়ে তিনি উদাসীন ছিলেন এবং যে শাশ্বত ও নিত্য বস্তুর দিকে জগৎ সুপ্ত থাকে, সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকতেন। (সুখিয়া সব সংসার হ্যায়, খায়ে অরু শোয়ে। দুখিয়া দাস কবির হ্যায় জাগে অরু রোয়ে- কবীর)। তাঁর অন্তঃকরণ প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত ছিল। কেউ না তো তাঁর বর্ণাশ্রম জানতে পেরেছে, আর না পেয়েছে, তাঁর কার্য্যপ্রণালীর হদিস। একই স্থানে বাস করেও, বিশ্বের সমস্ত ঘটনার খবর তাঁর মুঠোয় থাকত। তাঁর দরবার অতি চিত্তাকর্ষক ছিল। তিনি অনেক রকমেরই গল্প-গুজব করতেন, কিন্তু তাঁর অখন্ড শান্তি কিঞ্চিৎমাত্র বিচলিত হত না। তিনি প্রতিদিন মস্‌জিদের দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকতেন। সকালে, দুপুরে ও বিকেলে নিয়মিতভাবে 'চাওড়ী'তে বেড়াতে যেতেন। সেই সময়ও

সর্বক্ষণ আত্মস্থিত থাকতেন। তিনি বিনম্র, দয়ালু ও অভিমান-শূণ্য ছিলেন। সর্বদাই সবাইকে সুখ দিয়েছেন। এইরূপ ছিলেন আমাদের শ্রী সাই বাবা যাঁর চরণস্পর্শ পেয়ে শিরডী পবিত্র হয়ে গেছে। তার মাহাত্ম্য অসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে জ্ঞানেশ্বর আলন্দীকে এবং একনাথ পৈঠনের উত্থান করেছিলেন, ঠিক সেইভাবে শ্রী সাইবাবা শিরডীকে উদ্দীপ্ত করেন। শিরডীর ফুল, পাতা ও পাথরও ধন্য, যারা শ্রী সাই চরণের চুম্বন পেয়েছে এবং তাঁর চরণের ধূলি মাথায় ধারণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। ভক্তদের জন্য শিরডী একটি দ্বিতীয় পন্‌ঢরপুরী, জগন্নাথপুরী, দ্বারকা, বেনারস (কাশী), মহাকালেশ্বর এবং মহাবলেশ্বর হয়ে গড়ে উঠল। শ্রী সাইয়ের দর্শন করাই ভক্তদের জন্য বেদমন্ত্র ছিল, যার পরিণামস্বরূপ আসক্তি কমতে থাকত এবং আত্মদর্শনের পথ সহজতম হয়ে যেত। তাঁর পাদসেবন করাই ত্রিবেণী (প্রয়াগ) স্নানের সমান এবং চরণামৃত পান করলেই সমস্ত ইচ্ছা পূরণের তৃপ্তি হত। তাঁর আদেশ আমাদের জন্য বেদবাক্য। প্রসাদ এবং উদী (বিভূতি) গ্রহণ করলে মন শুদ্ধ হত। তিনি আমাদের রাম, কৃষ্ণ ও পরমব্রহ্ম, যিনি আমাদের মুক্তি প্রদান করলেন। তিনি কখনো নিরাশ বা হতাশ হতেন না। তিনি ছিলেন আনন্দের মঙ্গলমূর্তি। নামমাত্রেই শিরডী তাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল কিন্তু তাঁর কার্য্যক্ষেত্র পাঞ্জাব, কলিকাতা, উত্তর ভারত, গুজরাত, ঢাকা এবং কোংকণ অবধি বিস্তৃত ছিল। শ্রী সাইবাবার খ্যাতি দিন-দিন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তরা দর্শন লাভের জন্য শিরডীতে আসতে শুরু করল। কেবলমাত্র দর্শনেই, লোকেদের হৃদয় শান্ত হয়ে যেত। তারা ঠিক সেই রকমই আনন্দ অনুভব করত, যেমন পন্ঢরপুরের শ্রী বিট্‌ঠলের দর্শন করলে আনন্দ হয়। এটা কোন

অতিরঞ্জিত উক্তি নয় - দেখুন একজনের এমনই অনুভূতি হয়েছিল।

গৌলী বুওয়া

প্রায় **৯৫** বছরের বয়োবৃদ্ধ ভক্ত, যাঁর নাম গৌলী বুওয়া ছিল, পন্ঢরীর এক পর্য্যটক ছিলেন। উনি **৮** মাস পন্ঢরপুরে এবং চার মাস (আষাঢ় থেকে কার্ত্তিক মাস অবধি) গঙ্গাতীরে বাস করতেন। জিনিষপত্র বইবার জন্য একটা গাধা নিজের কাছে রাখতেন এবং একজন শিষ্যও সব সময় ওঁর সঙ্গে থাকত। উনি প্রতি বছর পন্ঢরপুর যেতেন এবং ফেররার পথে শ্রী বাবার দর্শন করার জন্য শিরডী আসতেন। বাবার প্রতি ওঁর অগাধ প্রেম ছিল। উনি নির্ণিমেষ নয়নে বাবার দিকে চেয়ে থাকতেন এবং বলে উঠতেন- 'এই তো শ্রী পন্ঢরীনাথ, শ্রী বিট্ঠলের অবতার, যিনি দীনের উপর কৃপা করেন ও অনাথের নাথ।' গৌলী বুয়া শ্রী বিট্ঠলের পরম ভক্ত ছিলেন। উনি অনেকবার পন্ঢরপুরের যাত্রা করেন এবং প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন যে, শ্রী সাইবাবা সত্যি-সত্যিই পন্ঢরীনাথ।

বিট্ঠল স্বয়ং আবির্ভূত হন

শ্রী সাইবাবার ঈশ্বর চিন্তন এবং ভজন-কীর্তনে বিশেষ অভিরুচি ছিল। তিনি সব সময় 'আল্লাহ মালিক' উচ্চারণ করতেন এবং ভক্তদের দিয়ে কীর্তন সপ্তাহের আয়োজন করাতেন। এটিকে 'নামসপ্তাহ'ও বলা যেতে পারে। একবার উনি দাসগণুকে নামসপ্তাহ (কীর্তন সপ্তাহ) করবার আদেশ দেন। তাতে দাসগণু বলেন- "আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য্য করছি, কিন্তু একটা আশ্বাস পেতে চাই যে, সপ্তাহের শেষে বিট্ঠল অবশ্যই দেখা দেবেন।' বাবা নিজের বুক স্পর্শ করে বললেন- "বিট্ঠল অবশ্যই দেখা দেবেন। কিন্তু তার জন্য ভক্তদের মধ্যে শ্রদ্ধা

ও তীব্র উৎকণ্ঠাও অত্যাবশ্যক। ঠাকুর নাথের ডঙ্কপুরী, বিট্ঠলের পন্ঢরী, রণছোড়ের দ্বারকা ত এখানেই। কারো অত দূরে যাওয়ার দরকার নেই। বিট্ঠল কি বাইরে কোথাও থেকে আসবেন? তিনি এখানেই বিরাজমান। **যখন ভক্তদের মধ্যে প্রেম এবং ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হবে, তখন বিট্ঠল স্বয়ং এখানে আবির্ভূত হবেন।"**

সপ্তাহ শেষ হওয়ার পর, বিট্ঠল ভগবান সত্যি-সত্যি দেখা দেন। কাকাসাহেব দীক্ষিত নিত্য নিয়মানুসারে স্নান করার পর, যখন ধ্যান করতে বসেন, তখন বিট্ঠলের দর্শন পান। দুপুরে যখন বাবার দর্শনার্থে মস্জিদে পৌঁছন, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "কি হে? বিট্ঠল পাটীল এসেছিলেন না? তুমি তাঁর দর্শন করলে? উনি খুব চঞ্চল। তাই কষে ধরে রেখো। যদি একটুও অসাবধান হও, তাহলে কিন্তু উনি পালিয়ে যাবেন।" এই ঘটনাটি ভোরবেলায় ঘটে এবং দুপুরবেলা কাকাসাহেব আবার দর্শন পান। ঠিক ঐ দিন, এক ছবি বিক্রেতা **২৫-৩০**টা বিঠোবার ছবি নিয়ে সেখানে বিক্রী করতে আসে। এই ছবিটি ঠিক ঐ রকমটি ছিল যেমনটি কাকাসাহেব ধ্যানে দেখেছিলেন। ছবিটি দেখে ও বাবার কথা স্মরণ করে কাকাসাহেব খুবই বিস্মিত ও আনন্দিত হন। উনি একটা ছবি সানন্দে কিনে নিজের পূজোর ঘরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঠানের অবসরপ্রাপ্ত মাম্লৎদার, শ্রী বি. ভি. দেব নিজের অনুসন্ধান দ্বারা এটা প্রমাণিত করে দিয়েছেন যে, শিরডী পন্ঢরপুরের পরিধির মধ্যেই পড়ে। দক্ষিণে পন্ঢরপুর শ্রীকৃষ্ণের প্রসিদ্ধ বাসস্থান, অতএব শিরডী দ্বারকাপুরী (সাই লীলা পত্রিকা ভাগ **২,** পৃষ্ঠা **১১০** থেকে

উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

চতুর্ণামপি বর্গণাং যত্র দ্বারাণি সর্বতঃ।
অতো দ্বারাবতীম্যুক্তা বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ।।

যেই স্থান চতুর্বর্ণের লোকেদের জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের জন্য সুলভ, দার্শনিকরা সেই জায়গাকে 'দ্বারকা' নামে ডাকেন। শিরডীতে বাবার মস্‌জিদ শুধুমাত্র চারি বর্ণের লোকেদের জন্যই নয়, বরং দলিত, অস্পৃশ্য ও ভাগোজী শিন্দের মত কুষ্ঠদের জন্যও খোলা ছিল। সুতরাং শিরডীকে দ্বারকা বলাই উচিত।

ভগবন্তরাও ক্ষীরসাগরের কথা

শ্রী বিট্‌ঠল পূজো বাবার কত ভালো লাগত, সেটা ভগবন্তরাও ক্ষীরসাগরের কাহিনীর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়। ভগবন্তরাও-য়ের বাবা বিঠোবার পরমভক্ত ছিলেন। উনি প্রতি বছর পন্ঢরপুরে জল নিয়ে যেতেন। ওঁর বাড়ীতে বিঠোবার একটা মূর্তিও ছিল এবং উনি তাঁর নিয়মিত পূজো করতেন। ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর ছেলে ভগবন্তরাও তীর্থযাত্রা, পূজো, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্ত বন্ধ করে দেন। যখন ভগবন্তরাও শিরডী আসেন তখন বাবা ওঁকে দেখেই বলে উঠেন- "এঁর পিতৃদেব আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাই আমি এঁকে এখানে ডেকেছি। ইনি কখনোই নৈবেদ্য অর্পণ করেননা এবং আমাকে ও বিঠোবাকে না খাইয়ে মারছেন। তাই আমি এঁকে এখানে আসার প্রেরণা দিই। এবার আমি জেদ করে এঁকে দিয়ে পুজো-অর্চনা শুরু করাব।"

দাসগণুর প্রয়াগ স্নান

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে প্রয়াগ এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। হিন্দুদের ধারণা যে, সেখানে স্নানাদি করলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়। তাই নানান পূজাপার্বণে ভক্তগণ সেখানে যান এবং স্নান করে পূণ্য লাভ করেন। একবার দাসগণুরও সেখানে গিয়ে স্নান করার ইচ্ছে জাগে। তাই উনি বাবার কাছে অনুমতি নিতে উপস্থিত হন। বাবা বললেন- **'মিছিমিছি অত দূর যাওয়ার কি দরকার? আমাদের প্রয়াগ তো এখানেই।** আমার উপর বিশ্বাস রাখো।" আশ্চর্য্য! মহান আশ্চর্য্য! যেই দাসগণু বাবার চরণে নতমস্তক হন, অমনি বাবার শ্রীচরণ হতে গঙ্গা-যমুনার ধারা বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। এই দৃশ্য দেখে দাসগণু প্রেমভাবে বিভোর হয়ে উঠলেন। চোখ থেকে প্রেমাশ্রু অঝোরে বইতে লাগল। ওঁর মুখ থেকে শ্রী সাই বাবার স্রোতস্বিনী স্বতঃপ্রবাহিত হতে লাগল।

শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন

শ্রী সাইবাবার মাতা, পিতা বা জন্মস্থানের বিষয়ে কেউই কিছু জানে না। এই বিষয়ে অনেক খোঁজ-খবর করা হয়েছে। বাবাকে ও অন্যলোকেদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সত্ত্বেও, কোন সন্তোষজনক উত্তর বা সূত্র পাওয়া যায়নি। আসলে আমরা এই ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। নামদেব এবং কবীর দাসের জন্ম অন্যান্য লোকদের মত হয়নি। নামদেবকে গোণাই ভীমরথী নদীর তীরে ও কবীর দাসকে তমাল ভাগীরথী নদীর তীরে পেয়েছিলেন। ঠিক এরকমই শ্রী সাইবাবার ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। তিনি শিরডীর এক নিম গাছের নীচে, ষোল বছরের তরুণ বালকের রূপে, ভক্তদের কল্যাণার্থে, দেখা দেন। সেই সময়ও তাঁকে দেখে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী মনে হত।

স্বপ্নেও তিনি কোন লৌকিক পদার্থের ইচ্ছা করতেন না। তিনি মায়াকে দূরে রাখতেন এবং মুক্তি তাঁর চরণে স্থান খুঁজত। শিরডী গ্রামের এক বৃদ্ধা (নানা চোপদারের মা) তাঁকে এইরূপ বর্ণনা করেছেন - "একটি তরুণ, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ এবং অতি রূপবান বালক নিম গাছের নীচে সমাধিতে লীন দেখা যায়। গ্রীষ্ম বা শীতের চিন্তা তার কিঞ্চিৎমাত্র ছিল না। তাঁকে এত অল্প বয়সে এত কঠিন তপস্যা করতে দেখে, লোকেরা খুব অবাক হত। দিনের বেলা তিনি কারো সাথে দেখা করতেন না এবং রাত্তিরে নির্ভয়ে একান্তে ঘুরে বেড়াতেন। লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করত যে, তরুণটি কোথা থেকে এসেছে। তাঁকে দেখতে এত সুন্দর ছিল যে, একবার দেখলেই মানুষ তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয়ে যেত। তিনি সর্বক্ষণ নিম গাছের নীচে বসে থাকতেন এবং কারো বাড়ী যেতেন না। যদিও বয়সে তরুণ ছিলেন, তবুও তাঁর ব্যবহার মহাত্মাদের মত ছিল। তিনি ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন।" একবার একটি খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। এক ভক্তের উপর ভগবান খান্ডোবা ভর করেন। সন্দেহ দূর করার জন্য লোকে বাবার বিষয়ে প্রশ্ন করে- "হে দেব! দয়া করে বলুন ইনি কোন ভাগ্যবান পিতার পুত্র এবং ইনি কোথা থেকে এসেছেন।" তখন ভগবান খাণ্ডোবা একটা কোদাল আনতে এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান খুঁড়তে বলেন। সেই স্থানটি বেশ খানিকটা খোঁড়া হলে, একটা পাথরের নীচে একটা ইঁট পাওয়া যায়। ইঁটটা সরাতেই, সেখানে একটা দরজা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে চারটি প্রদীপ জ্বলছিল। ঐ দরজা থেকে একটি পথ একটি গুহার দিকে যাচ্ছিল যেখানে গোমুখী আকারের একটি ইমারত, একটা কাঠের তক্তা, মালা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। ভগবান খান্ডোবা বললেন- "এই যুবকটি এখানে বারো

বছর তপস্যা করেছে।" এরপর লোকেরা দরজাটাকে আবার বন্ধ করে দেয়। যেরকম অশ্বত্থ গাছকে আমরা পবিত্র মনে করি, ঠিক সেরকমই বাবা এই নিম গাছটিকে পবিত্র মনে করতেন ও খুবই ভালবাসতেন। মহালসাপতি এবং শিরডীর অন্যান্য ভক্তরা এই স্থানটিকে বাবার গুরুর সমাধিস্থল মনে করে, সদা সশ্রদ্ধায় প্রণাম করতেন।

তিনটি 'ওয়াড়া'

নিমগাছের চারপাশের জমিটি শ্রী হরি বিনায়ক সাঠে কিনে, সেখানে একটা বিশাল ভবন নির্মাণ করান, যার নাম 'সাঠে ওয়াড়া' রাখা হয়। বাইরের লোকেদের জন্য এই ভবনটিই একমাত্র বিশ্রাম গৃহ ছিল এবং সেখানে সর্বক্ষণই ভিড় থাকত। নিম গাছের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট্ট মন্দির আছে, যেখানে ভক্তরা দালানের উপর উত্তরাভিমুখী হয়ে বসে থাকতেন। লোকেদের বিশ্বাস যে, যারা বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবারে সন্ধ্যার সময় সেখানে ধূপ ইত্যাদি সুগন্ধিত পদার্থ জ্বালায়, তারা ঈশ্বরের কৃপায় সর্বদা সুখী থাকবে। এই ভবনটি খুবই পুরনো ও জরা-জীর্ণ অবস্থায় ছিল। তার জীর্ণতা সংস্কার করাবার নিতান্তই দরকার ছিল। এই কাজটি সংস্থান দ্বারা করা হয়। কিছুদিন পর আরেকটি ভবন তৈরী করা হয় এবং এর নাম "দীক্ষিত ওয়াড়া" রাখা হয়। কাকাসাহেব দীক্ষিত ইংল্যান্ডে থাকাকালীন, এক দুর্ঘটনায়, পায়ে গুরুতর আঘাত পান। উনি অনেক রকমের চিকিৎসা করান, কিন্তু সেই চোটের থেকে আরোগ্যলাভ হচ্ছিল না। নানাসাহেব চাঁদোরকর তাঁকে বাবার কৃপা প্রাপ্ত করবার পরামর্শ দেন। তাই কাকাসাহেব দীক্ষিত স্থায়ীভাবে শিরডীতে থাকবেন বলে স্থির করেন এবং ভক্তদের থাকার জন্য একটা ভবন নির্মাণ করান। এই ভবনের শিলান্যাস **৯-১২-১৯১০** সালে হয়। ঐ দিনেই

আরো দুটি বিশেষ ঘটনা ঘটে - **১)** শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি পান। **২)** চাওড়ীতে রাত্তিরের আরতি আরম্ভ হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ভবন পুরোপুরি তৈরী হয়ে যায় এবং রামনবমীর **(১৯১১)** শুভ দিনে এর উদ্‌ঘাটন করা হয়। এর পর, নাগপুরের এক লক্ষপতি, শ্রী বুটী সাহেব আরেকটি ভবন নির্মাণ করান। এই ভবন নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু ওঁর সমস্ত পরিশ্রম ও ধনব্যায় সার্থক হয়েছিল কারণ বাবার পবিত্র শরীর এখন ওখানেই শায়িত রয়েছে। বুটী 'ওয়াড়া'ই বর্ত্তমানে 'সমাধি-মন্দির' নামে বিখ্যাত। এই মন্দিরের জায়গায়, এক সময় একটা বাগান ছিল, যেখানে বাবা স্বয়ং গাছে জল দিতেন এবং দেখাশুনা করতেন। যেখানে এক সময় একটা ছোট্ট কুটীরও ছিল না, সেখানে তিন-তিনটে ভবন নির্মাণ হয়ে গেল। এদের মধ্যে, 'সাঠে ওয়াড়া' গোড়ার দিকে খুবই উপযোগী ছিল। বাগানের কথা, বামন তাত্‌য়ার সাহায্যে স্বয়ং বাগানের দেখাশোনা, শিরডী থেকে শ্রী সাইবাবার অস্থায়ী অনুপস্থিতি এবং চাঁদ পাটীলের বরযাত্রীর সাথে আবার শিরডী ফেরা, দেবীদাস, জানকী দাস এবং গঙ্গাগীরের সঙ্গতি, মোহিদ্দীন তম্বোলীর সাথে কুস্তি, মস্‌জিদে তাঁর অবস্থান, শ্রী ডেঙ্গলে এবং অন্যান্য ভক্তদের প্রতি প্রেম এবং অন্যান্য ঘটনাগুলির বর্ণনা পরের অধ্যায়ে করা হবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৫

চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে শ্রী সাইবাবার পুণঃ আগমন, অভিনন্দন এবং 'শ্রী সাই' শব্দ দ্বারা সম্বোধন, অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বেশভূষা এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী, পাদুকার কথা, মোহিদ্দীনের সাথে কুস্তি এবং জীবন পরিবর্তণ, জলের তেলে রূপান্তর, নকল গুরু জৌহর আলী।

গত অধ্যায়ে যেমনটি আমি উল্লেখ করেছিলাম, এবার শ্রী সাইবাবার শিরডী থেকে অন্তর্ধাণ হওয়ার পর, তাঁর শিরডীতে পুনরায় কিভাবে আগমন হলো - সেটাই বর্ণনা করা হচ্ছে।

চাঁদ পাটীলের শালার বরযাত্রীর সাথে পুণঃ আগমন

ঔরাঙ্গাবাদ জেলার (নিজাম স্টেট) ধূপগ্রামে চাঁদ পাটীল নামে এক ধনী মুসলমান থাকতেন। ঔরাঙ্গাবাদ যাওয়ার পথে তাঁর ঘোটকী হারিয়ে যায়। দু'মাস ধরে অনেক খোঁজাখুজি করার পরও, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। অবশেষে নিরাশ হয়ে জিনটা কাঁধে ফেলে, তিনি ঔরাঙ্গাবাদ ফিরছিলেন। প্রায় চোদ্দ মাইল হাঁটার পর, তিনি এক জায়গায় একটি আম গাছের নীচে এসে দেখেন এক ফকির সেখানে বসে আছে। তাঁর মাথায় একটা টুপী, গায়ে কফনী এবং কাছেই একটা ছোট লাঠি রাখা ছিল। ফকিরের ডাকে চাঁদ পাটীল তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জীনটা দেখে ফকির জিজ্ঞাসা করেন, "এই জিনটা এখানে কেন?" চাঁদ পাটীল নৈরাশ্য ভরা স্বরে বললেন-

"কি আর বলি? আমার একটি ঘোটকী ছিল, সেটা কোথাও হারিয়ে গেছে - এটা তারই লাগাম ছিল।"

ফকির বললেন- "একটু নালার দিকে খুঁজে দেখো।" চাঁদ পাটীল নালার কাছে গিয়ে দেখেন, ঘোটকী সেখানে ঘাস খাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে, তাঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। তিনি তক্ষুনি বুঝতে পারেন যে, ফকির কোন সাধারণ লোক নয়, বরং কোন উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী পুরুষ। ঘোটকী নিয়ে যখন তিনি ফকিরের কাছে ফিরে আসেন, ততক্ষনে ফকির ছিলিম তৈরী করে নিয়েছেন - শুধু দুটি জিনিষের দরকার ছিল। এক তো ছিলিম জ্বালাবার জন্য আগুন ও দ্বিতীয়, কাপড়টা ভেজাবার জন্য জল। ফকির নিজের চিমটেটি মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে বার করতেই, তার সাথে একটা জ্বলন্ত কয়লা বেরোল। সেটা ছিলিমের উপর রাখা হলো। এরপর ফকির পাশে রাখা লাঠিটা দিয়ে যেই মাটিতে ঠুকলেন, সেখান থেকে জলের ধারা বেরোতে লাগল, এবং কাপড়টা তাতে ভিজিয়ে ছিলিমে জড়িয়ে নিলেন। এভাবে সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর, বাবা ছিলিমে টান দেন এবং চাঁদ পাটীলের দিকে এগিয়ে দেন। এই সব চমৎকার দেখে, চাঁদ পাটীল খুবই বিস্মিত হন। তিনি ফকিরকে নিজের বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। পরের দিন ফকির চাঁদ পাটীলের সাথে তার বাড়ী যান এবং সেখানে কিছুদিন থাকেন। পাটীল ছিলেন ধূপগ্রামের এক উচ্চ পদাধিকারী। তাঁর বাড়ীতে তাঁর শ্যালকের বিয়ের তোড়জোড় চলছিল। বরযাত্রী শিরডী অভিমুখে রওনা হয়। ফকিরও বরযাত্রীদের সাথে শিরডী যান। বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল এবং বরযাত্রীরা সকুশলে ধূপগ্রাম ফিরে এলো। কিন্তু সেই ফকির, শিরডীতেই থেকে গেলেন এবং শেষ জীবন অবধি সেখানেই ছিলেন।

ফকিরের 'সাই' নাম পাওয়া

শিরডী পৌঁছেই বরযাত্রীদের খান্ডোবা মন্দিরের কাছে মহালসাপতির ক্ষেতের মধ্যে একটা গাছের নীচে বিশ্রাম করতে বলা হলো। খান্ডোবা মন্দিরের সামনেই গরুর গাড়ীগুলোকে দাঁড় করানো হয় এবং সব বরযাত্রীরা এক-এক করে নীচে নামে। তরুণ ফকিরকে নীচে নামতে দেখে, মহালসাপতি 'এসো সাই' বলে তাঁকে অভিনন্দন করেন। অন্যান্য উপস্থিত লোকেরাও, তাঁকে 'সাই' বলেই সম্বোধন করে তাঁকে স্বাগত জানান। এর পর থেকে তিনি 'সাই' নামেই প্রসিদ্ধ হন।

অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সংযোগ

শিরডী আসার পর শ্রী সাইবাবা মস্‌জিদে থাকতে শুরু করলেন। বাবার শিরডী আসার অনেক আগে থেকেই, দেবীদাস নামে এক সন্ত বহু বছর ধরে ওখানে থাকতেন। উনি বাবার খুব প্রিয় ছিলেন। বাবা ওঁর সাথে কখনো হনুমান মন্দিরে তো কখনো 'চাওড়ীতে' থাকতেন। কিছুদিন পর জানকীদাস নামে এক সন্ত শিরডীতে আসেন এবং তখন থেকে বাবা জানকীদাসের সাথে কথাবার্তায় অনেকটা সময় কাটাতে শুরু করেন। জানকীদাস কখনো-কখনো বাবার কাছে এসে বসতেন। তেমনি পুন্তাম্বের শ্রী গঙ্গাগীর নামে এক বৈশ্য গৃহী সন্তও প্রায়ই বাবার কাছে আসা-যাওয়া করতেন। প্রথমবার বাবাকে বাগানে জল দেওয়ার জন্য জল বইতে দেখে তাঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। তিনি স্পষ্টই বলেন যে- **"শিরডী পরমভাগ্যবতী, তার কোলে এক অমূল্য হীরে আছে।** তোমরা যাকে এরকম পরিশ্রম করতে দেখছ, তিনি কোন সাধারণ বা সামান্য পুরুষ নন। এই ভূমির পরম সৌভাগ্যে যে, তার পুণ্যবলে এইখানে এই রত্ন আবির্ভূত হয়েছে।"

ঠিক এইরূপ শ্রী আক্কালকোট্ মহারাজের এক প্রসিদ্ধ শিষ্য সন্তশ্রী আনন্দ নাথ (এওলামঠ), যিনি কিছু শিরডীবাসীদের সাথে শিরডী আসেন, বাবার বিষয়ে বলেছিলেন, **"যদিও বাইরে থেকে এঁকে সাধারণ মানুষের মতনই মনে হয়, ইনি কিন্তু আসলে এক অসাধারণ ব্যক্তি।** এই কথাটা তোমরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে।" এই বলে তিনি এওলা ফিরে যান। এটা সেই সময়কার কথা, যখন শিরডী খুবই সাধারণ গ্রাম ছিল এবং সাইবাবার বয়সও ছিল কম।

বাবার পোষাক পরিচ্ছদ ও দৈনন্দিন কর্মসূচী

তরুণ অবস্থায় শ্রী বাবা নিজের চুল কখনো কাটেননি এবং তিনি সব সময়ই পালোয়ানদের মত পোষাক পরে থাকতেন। রাহাতা (শিরডী থেকে তিন মাইল দূর) গেলে সেখান থেকে তিনি গাঁদা, জুঁই ইত্যাদির গাছ কিনে আনতেন। সেগুলিকে পরিষ্কার করে মাটিতে পুঁতে, তাতে নিজে জল দিতেন। ওয়ামন তাত্য়া নামক এক ভক্ত তাঁকে রোজ মাটির দুটো ঘড়া দিত। বাবা এই ঘড়ায় করে গাছে জল দিতেন। তিনি নিজে কূয়ো থেকে জল আনতেন এবং সন্ধ্যার সময় ঘড়া দুটিকে নিম গাছের নীচে রেখে দিতেন। নীচে রাখতেই সেগুলি ভেঙ্গে যেত। আগুনে না তাপিয়ে (সেঁকে) সেগুলি কাঁচা মাটি দিয়ে গড়া হত। পরের দিনে তাত্য়া বাবাকে আবার দুটো নতুন ঘড়া দিতো। এইরকম ব্যবস্থা তিন বছর পর্যন্ত চলল। শ্রী সাইবাবার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে, একটি সুন্দর বাগান তৈরী হয়েছিল। আজকাল এই স্থানটিতেই, বাবার সমাধি মন্দিরের সুন্দর ভবন বিরাজমান, যেখানে সহস্র ভক্ত আসা-যাওয়া করে।

নিম বৃক্ষের নীচে পাদুকার কাহিনী

শ্রী আক্কালকোট্ মহারাজের এক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণজী অলীবাগকর তাঁর ছবির নিয়মিত পূজো করতেন। উনি একবার আক্কালকোট্ (সোলাপুর জিলা) গিয়ে মহারাজের পাদুকার দর্শন এবং পূজো করবেন স্থির করেন। কিন্তু আক্কালকোট্ মহারাজ স্বপ্নে দর্শন দিয়ে ওঁকে বলেন- "আজকাল শিরডীই আমার বিশ্রাম স্থল এবং তুমি ওখানে গিয়েই আমার পূজো করো।" সেই জন্য, তিনি গন্তব্য স্থান বদলে, শিরডী এসে শ্রী সাইবাবার পূজো করেন। তিনি সানন্দে শিরডীতে ছ'মাস থাকেন এবং এই স্বপ্নের স্মৃতিস্বরূপ পাদুকা তৈরী করান। **১৯১২** সালে শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন, নিম গাছের নীচে পাদুকা স্থাপনা করেন। দাদা কেলকর এবং উপাসনী মহারাজ স্থাপনা উৎসব যথাবিধি রূপে সম্পন্ন করেন। একজন দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে পুজোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থার ভার, এক ভক্ত শ্রী সগুন মেরু নায়ককে দেওয়া হয়।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ

ঠানের অবসরপ্রাপ্ত মাম্লৎদার শ্রী বি. ভি. দেব (শ্রী সাইবাবার এক পরমভক্ত) সগুন মেরু নায়ক ও গোবিন্দ কমলাকর দীক্ষিতকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। পাদুকার সম্পূর্ণ বিবরণ, শ্রী সাই লীলা ভাগ**১১** সংখ্যা **১,** পৃষ্ঠ **২৫** প্রকাশিত হয়েছিল। নীচে সেই বিবরণই দেওয়া হচ্ছে ঃ-

১৯১২ সালে বম্বের এক ভক্ত, (ডাক্তার) রামরাও কোঠারে বাবার দর্শনের জন্য শিরডী এসেছিলেন। ওঁর কম্পাউন্ডার ও এক বন্ধু শ্রী ভাই কৃষ্ণজী অলীবাগকরও ওঁর সঙ্গে শিরডী আসেন। কম্পাউন্ডার

ও শ্রী ভাইয়ের সগুণ মেরু নায়ক এবং জী. কে. দীক্ষিতের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। অন্যান্য বিষয় আলোচনা করতে-করতে এঁদের মনে হয় যে, শ্রী সাইবাবার শিরডীতে প্রথম আগমন এবং নিমবৃক্ষের নীচে বাসের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্বরূপ, কেন না পাদুকা স্থাপিত করা হোক? এবার পাদুকা তৈরী করানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। তখন শ্রী ভাইয়ের বন্ধু কম্পাউন্ডার বললেন- "যদি এই কথাটি আমার মনিব ডাঃ কোঠারে জানতে পারেন, তাহলে এর জন্য অতি সুন্দর পাদুকা বানিয়ে দেবেন।" এই প্রস্তাবটি সবার মনে ধরে এবং ডা. কোঠারেকে এ বিষয়ে খবর দেওয়া হলো। উনি শিরডী এসে পাদুকার একটি নক্শা আঁকেন এবং এ বিষয়ে উপাসনী মহারাজের সাথে খান্ডোবা মন্দিরে দেখা করেন। উপাসনী মহারাজ তাতে কিছু পরিবর্তণ করে এবং পদ্মফুলাদি এঁকে তার নীচে নিম বৃক্ষের মাহাত্ম্য ও বাবার যোগশক্তি সম্বন্ধে একটি শ্লোকও লিখে দেন। শ্লোকটি হচ্ছে-

সদা নিম্ব-বৃক্ষস্য মূলাধিবাসাত্
সুধাস্রাভিনং তিক্তমপ্যপ্রিয়তম্
তরুম্ কল্প-বৃক্ষাদিকং সাধয়ান্তম্
নমামীশ্বরং সদ্‌গুরুং সাইনাথাম্

অর্থাৎ - আমি ভগবান সাইনাথকে প্রণাম করছি, যাঁর সান্নিধ্যে নিম বৃক্ষ কটু এবং অপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও অমৃত বর্ষণ করছে। এই বৃক্ষের রসকে অমৃত বলা হয়। অনেক ব্যাধি হতে মুক্তি দেওয়ার গুণ এতে থাকার দরুণ একে কল্পবৃক্ষ'র চেয়েও শ্রেষ্ঠ মানা হয়।

উপাসনী মহারাজের বিচার সর্বমান্য এবং কার্যান্বিত হলো। পাদুকার

জোড়া বম্বেতে তৈরী করানোর পর, কম্পাউন্ডারের হাতে শিরডী পাঠানো হয়েছিল। বাবার আজ্ঞা অনুসারে, পাদুকার স্থাপনা শ্রাবণ পূর্ণিমার শুভদিনে করা হলো। ঐ দিন বেলা **১১** টা নাগাদ শ্রী জি. কে. দীক্ষিত বাবার পাদুকা মাথায় করে খান্ডোবা মন্দির থেকে দ্বারকামাইতে খুব ধূমধাম করে নিয়ে আসেন। বাবা পাদুকা দুটি স্পর্শ করে বললেন- **"এইটি ভগবানের শ্রীচরণ। নিম বৃক্ষের নীচে স্থাপনা করে দাও।"** এর একদিন আগেই বম্বের এক পারসী ভক্ত, শ্রী পাস্তা সেঠ, **২৫** টাকার মানি অর্ডার পাঠান। বাবা সেই টাকাটি পাদুকা স্থাপনার জন্য দেন। এই সমারোহে (স্থাপনার কার্য্যে) ঠিক একশো টাকা ব্যয় হয়, যার মধ্যে পঁচাত্তর টাকা চাঁদার দ্বারা যোগাড় করা হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর ডাঃ কোঠারে প্রদীপের জন্য প্রত্যেক মাসে দুটাকা করে পাঠাতেন। পাদুকার চারপাশে লাগাবার জন্য লোহার ছড়িও পাঠান। আজকাল জখাদি (নানা পূজারী) পূজো করেন এবং সগুণ মেরু নায়ক নৈবেদ্য অর্পণ করেন ও সন্ধ্যার সময় প্রদীপ জ্বালান। ভাই কৃষ্ণজী আগে আক্কালকোট্ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। আক্কালকোট্ যাওয়ার পথে উনি পাদুকা স্থাপনার শুভ উপলক্ষে শিরডী আসেন এবং দর্শন করার পর যখন উনি প্রস্থান করার জন্য বাবার কাছে অনুমতি নিতে যান, তখন বাবা বলেন- "আরে, আক্কালকোটে কি আছে? তুমি ওখানে মিছিমিছি কেন যাচ্ছো? ওখানকার মহারাজ (আমি স্বয়ং) তো এখানেই আছেন।" এই কথা শুনে ভাই আক্কালকোট যাওয়ার বিচার ছেড়ে দেন। পাদুকা স্থাপনার পরও, উনি প্রায়ই শিরডী আসতেন। শ্রী বি. ভি. দেব শেষে লিখেছেন যে, এই সব ঘটনাগুলি শ্রী হেমাডপন্ত জানতেন না। নতুবা শ্রী সাই চরিত্রে লিখতে ভুলতেন না।

মোহিদ্দীন তম্বোলীর সাথে কুস্তি ও জীবন পরিবর্তন

শিরডীতে মোহিদ্দীন তম্বোলী নামে এক পালোয়ান ছিল। কোন এক বিষয় নিয়ে, ওর বাবার সাথে মতভেদ হয়। ফলতঃ দুজনের মধ্যে কুস্তি হয় এবং বাবা হেরে যান। এর পর বাবা নিজের পোষাক ও থাকার ধরন-ধারণ বদলে ফেলেন। তিনি কফ্নী ও লেংগোট পড়তেন এবং একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথাটা ঢেকে রাখতেন। বসবার ও শোওয়ার জন্য একটা ছালার টুকরো ব্যবহার করতেন। এরকম ছেঁড়া-মেড়া কাপড় পরেও, তিনি খুবই সন্তুষ্ট থাকতেন। তিনি সর্বদাই বলতেন- "দারিদ্রতাই আসল রাজত্ব, ধনীর চেয়ে দরিদ্র লাখ গুণে ভাল, ভগবান গরীবের ভাই।" গঙ্গাগীরেরও কুস্তী লড়ার খুব সখ ছিল। এক সময় কুস্তী লড়তে লড়তে, হঠাৎ ওঁর মনে ত্যাগের ভাবনা জাগে। এই উপযুক্ত সময় উনি দেববাণী শোনেন, **"ভগবানের সাথে খেলায় নিজের দেহকে লাগিয়ে দেওয়া উচিত।"** তাই ওঁর সংসার ছেড়ে আত্ম-অনুভূতির পথে চলার তীব্র ইচ্ছে জাগে। পূণ্তাম্বের কাছে একটি মঠ বানিয়ে, নিজের শিষ্যদের সাথে সেখানে থাকতে শুরু করেন। শ্রী সাইবাবা লোকেদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন না আর নাই বিশেষ কথা বলতেন। যদি কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করত, তখন তিনি শুধু তার উত্তরটা দিতেন। দিনের বেলা তিনি নিম বৃক্ষের নীচে বিরাজমান থাকতেন। কখনো-কখনো গ্রামের সীমাতে নালার কাছে গাছের ছায়ায় বসে থাকতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় যেদিকে খুশী সেদিকে বেড়াতে বেরিয়ে যেতেন। নিমগ্রামের বালাসাহেব ডেঙ্গলের বাড়ী প্রায়ই চলে যেতেন। বাবা শ্রী বালাসাহেবকে খুব ভালোবাসতেন। ওঁর ছোট ভাই শ্রী নানাসাহেবের, দ্বিতীয় বার বিয়ে করা সত্ত্বেও, কোন সন্তান হয়নি। বালাসাহেব নানাসাহেবকে শ্রী

সাইবাবার দর্শনার্থে শিরডী পাঠান। কিছুদিন পর বাবার শ্রীকৃপায়, নানাসাহেবের বাড়ীতে পুত্রের জন্ম হয়। এরপর থেকেই বাবার দর্শনের জন্য লোকেদের সংখ্যা দিনের-পর-দিন বাড়তে থাকে। তাঁর নাম ও কীর্তি দূর-দূর প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে যায়। আহমদনগরেও তাঁর খুব নাম হয়ে পড়েছিল। নানাসাহেব চাঁদোরকর, কেশব চিদম্বর এবং অন্যান্য ভক্তরা তখন থেকেই শিরডীতে আসতে শুরু করেছিলেন। সারাদিন বাবা ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন ও রাতে, পুরানো জীর্ণ মস্জিদে বিশ্রাম করতেন। এই সময় বাবার কাছে ছিলিম, তামাক, একটি বড় গেলাস, একটি লম্বা কফ্নী, মাথায় বাঁধবার কাপড় এবং একটি ছোট লাঠি ছিল যেটি তিনি সর্বদা নিজের কাছে রাখতেন। মাথায় একটা সাদা কাপড়ের টুকরো এমনভাবে বাঁধতেন যে, কাপড়ের একটা দিক তাঁর বাঁ কাঁধ দিয়ে পিঠে পড়ে থাকত, যেন চুলের একটি খোঁপা। পায়ে কোন জুতো বা চটি পরতেন না। শুধু একটা ছালার টুকরো অধিকাংশ দিন তাঁর আসন হিসেবে কাজ দিত। তিনি ধুনিতে কাঠের টুকরোর রূপে নিজের অহংকার, সমস্ত ইচ্ছা এবং কুবিচারগুলির আহুতি দিতেন। সর্বক্ষণ 'আল্লাহ মালিক' উচ্চারণ করতেন। তিনি যে মস্জিদে পদার্পণ করেন, তাতে কেবল দুটি ঘরের মত লম্বা জায়গা ছিল এবং এখানেই সব ভক্তরা তাঁর দর্শন করত। **১৯১২**র পর কিছু পরিবর্তণ ঘটে। পুরোন মস্জিদের জীর্ণতা সংস্কার করা হয় এবং তার মেঝেও বানানো হয়। মস্জিদে থাকতে শুরু করার আগে, বাবা তাকিয়াতে (ফকিরদের বাসস্থান) থাকতেন। তিনি পায়ে নূপুর বেঁধে প্রেমবিহ্বল হয়ে সুন্দর নৃত্য ও গানও করতেন।

জলের তেলে পরিণত হওয়া

বাবা আলো খুব ভালবাসতেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা তেল ভিক্ষে করে নিয়ে আসতেন এবং প্রদীপ জ্বালিয়ে মস্‌জিদ সাজাতেন। এভাবে কিছুদিন সব ঠিকঠাক চলল। কিন্তু একদিন ময়রারা উত্যক্ত হয়ে স্থির করল যে সেদিন কেউ বাবাকে তেল দেবে না। নিত্য নিয়মানুসারে যখন বাবা তেল চাইতে পৌঁছলেন, তখন তাঁকে প্রত্যেক দোকান থেকেই খালি হাতে ফিরে আসতে হলো। কাউকে কিছু না বলে, বাবা মস্‌জিদে ফিরে এলেন। শুকনো তুলোর সলতে প্রদীপ গুলিতে পরালেন। ময়রারা খুব উৎসুক হয়ে দেখছিল বাবা এবার কি করবেন? বাবা বড় গেলাসটি, যাতে অল্প একটু তেল ছিল, ওঠালেন। তাতে একটু জল মিশিয়ে, সেটাকে পান করে নিলেন। সেটাকে আবার গেলাসে উগড়ে, সেই তৈলাক্ত জল প্রদীপগুলিতে ঢেলে সেগুলি জ্বালিয়ে দিলেন। উৎসুক ময়রারাও প্রদীপগুলিকে আগের মতই রাতভোর জ্বলতে দেখে নিজেদের ব্যবহারের জন্য খুবই লজ্জিত বোধ করল। ওরা বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইল। বাবা তাদের ক্ষমা করে ভবিষ্যতে সৎ আচরণ করার শিক্ষা দেন।

নকল গুরু জৌহর আলী

পূর্বে বর্ণিত কুস্তির ঘটনার প্রায় পাঁচ বছর পর, জৌহর আলী নামে এক ফকীর নিজের শিষ্যদের সাথে রাহাতা আসেন। উনি বীরভদ্র মন্দিরের কাছে একটা বাড়ীতে থাকতেন। ফকির বিদ্বান ছিলেন। কোরানের প্রত্যেকটি কল্‌মা কণ্ঠস্থ ছিল এবং স্বরও মধুর ছিল। গ্রামের অনেক ধার্মিক ও শ্রদ্ধালু জন ওঁর কাছে আসতে শুরু করে। লোকেদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে, বীরভদ্র মন্দিরের কাছে একটা ইদগাহ্ তৈরী করাবার কথা স্থির করে। কিন্তু

এ বিষয়ে কিছু ঝগড়ার সৃষ্টি হওয়ায়, জৌহর আলী রাহাতা ছেড়ে, শিরডী এসে বাবার সাথে মস্‌জিদেই থাকতে শুরু করেন। নিজের মিষ্টি মধুর কথায়, উনি সহজেই শিরডী বাসীদের মন কেড়ে নেন এবং বাবাকে নিজের শিষ্য বলে প্রচার করেন। বাবা তাতে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন না এবং ওর শিষ্য হওয়া স্বীকার করেন। এরপর গুরু ও শিষ্য আবার রাহাতাতে এসে থাকতে শুরু করেন। গুরু শিষ্যের যোগ্যতার বিষয়ে জানতেন না। কিন্তু শিষ্য গুরুর দোষের ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তা সত্ত্বেও, বাবা কখনো ওঁকে অশ্রদ্ধা করেননি বরং মন লাগিয়ে নিজের কর্তব্য পালন করে, অনেক ভাবে ওঁর সেবা করেন। তাঁরা কখনো-কখনো শিরডী আসতেন, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় রাহাতাতেই থাকতেন। বাবার ভক্ত-প্রেমীদের তাঁর দূরে রাহাতাতে থাকাটা একেবারেই ভালো লাগছিল না। তাই ওরা সবাই মিলে, বাবাকে শিরডীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য রাহাতা গেল। 'ঈদ্‌গা'-র কাছেই এদের বাবার সাথে দেখা হয় এবং ওরা নিজেদের উদ্দেশ্য বাবাকে জানায়। তখন বাবা বলেন যে ফকির ভীষণ রাগী ও বদ্‌মেজাজী লোক; উনি বাবাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। ফকিরের আসার আগেই বাবা তাদের ফিরে যেতে বলেন। যখন এইসব কথাবার্তা চলছিল, তখন ফকির সেখানে এসে পৌঁছান। গ্রামবাসীদের জল্পনা-কল্পনার কথা জেনে, উনি খুবই রেগে ওঠেন। বেশ বাদ-বিবাদের পর শেষে নির্ণয় হয় যে, ফকির আর শিষ্য দুজনই শিরডীতে থাকবেন এবং এইভাবে ওঁরা শিরডীতেই থাকতে শুরু করেন। কিছুদিন পর দেবীদাস গুরুর পরীক্ষা নেন এবং কিছু ত্রুটি পান। চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে বাবার শিরডী আসার প্রায় ১২ বছর আগে, দেবীদাস শিরডী আসেন- তখন ওঁর বয়স ছিল ১০-

১১ বছর এবং উনি হনুমান মন্দিরে থাকতেন। দেবীদাস তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্যাগের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ও অগাধ জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন। অনেকে, যেমন- তাত্য়া কোতে, কাশীনাথ ইত্যাদি তাঁকে গুরুর মত সম্মান করত। তাই জৌহর আলীকে তাঁর সামনে আনা হলো। তর্কে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে, জৌহর আলী শিরডী থেকে পালিয়ে যান। অনেক বছর পর, উনি শিরডীতে ফিরে আসেন এবং শ্রী সাইবাবার চরণ বন্দনা করেন। তিনি গুরু ও শ্রী সাইবাবা তাঁর শিষ্য - ওঁর এই ধারনা দূর হয়ে গিয়েছিল। শ্রী সাইবাবা তাঁকে গুরুর মতনই মান দিতেন, এই কথা স্মরণ করে ওঁর খুব অনুতাপ হয়। এইভাবে শ্রী বাবা নিজের আচরণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিলেন যে, এইভাবে অহংকারশূণ্য হয়ে শিষ্যের কর্তব্য পালন করে, আত্মানুভূতির পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। উপরে উদ্ধৃত ঘটনাক্রম ভক্ত ম্হালসাপতির কাছ থেকে জানা যায়। এর পরের অধ্যায়ে রাম নবমীর উৎসব, পূর্বে মস্জিদের দশা, পরে তার জীর্ণতা সংস্কার ইত্যাদি বর্ণনা করা হবে।

।। श्री साईनाथार्पनमस्तु। शुभम् भवतु।।

অধ্যায় - ৬

রাম নবমীর উৎসব, মস্জিদের জীর্ণতা সংস্কার, গুরুর করস্পর্শের মহিমা, চন্দন সমারোহ, উর্স এবং রামনবমীর সমন্বয়।

গুরুর করস্পর্শের গুণ

যখন সদ্গুরুই নৌকার নাবিক, তখন তিনি নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে ও সহজেই এই ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন। 'সদ্গুরু' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্রই, শ্রী সাইবাবার কথা মনে পড়ে। মনে হচ্ছে যেন তিনি স্বয়ং আমার সামনে দাঁড়িয়ে, আমার মাথায় উদী লাগিয়ে দিচ্ছেন। আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বয়ে যাচ্ছে। সদ্গুরুর করস্পর্শের শক্তি মহান ও আশ্চর্য্যজনক। যে সূক্ষ্ম শরীর, সমগ্র সংসারকে ভস্ম করে দিতে পারে এমন অগ্নি দ্বারাও নষ্ট হয় না, সেটাই গুরুর হাতের স্পর্শে এক নিমেষে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রী সাইবাবার মনোরম রূপ দর্শন করে গলা রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যখন হৃদয় ভাবান্বিত হয়ে যায়, তখন 'আমিই সে' (সোহম্) ভাব জাগৃত হয়ে, আত্মানুভূতির আনন্দের আভাস হয়। 'আমি' আর 'তুমি'-র পার্থক্য (দ্বৈত ভাব) নষ্ট হয়ে যায় এবং ততক্ষণাৎ ব্রহ্মের সাথে অভিন্নতা অনুভব হয়। যখন আমি কোন ধার্মিক গ্রন্থ পাঠ করি, তখন প্রতিপদে সদ্গুরুর স্মৃতি মনে জেগে ওঠে। বাবা শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ রূপে তাঁর জীবন-গাথা শুনিয়ে যান। যখন আমি ভাগবত পাঠ শ্রবণ করি, তখন বাবা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ধারণ করেন এবং এইরূপ মনে হয় যেন তিনিই ভক্তদের কল্যাণ হেতু উদ্ধবগীতা শোনাচ্ছেন। কারো সঙ্গে আলোচনা

করার সময়, আমি বাবার কথাগুলি স্মরণ করি, যাতে উপযুক্ত অর্থ বোঝাতে পারি। নিজে থেকে যখন কিছু লিখতে যাই, তখন একটা শব্দ বা বাক্যও রচনা করে উঠতে পারি না। কিন্তু যখন বাবা স্বয়ং কৃপা করে আমাকে দিয়ে লেখাতে শুরু করেন, তখন তার আর কোন শেষ থাকে না। যখন ভক্তদের মধ্যে অহংকার বাড়তে শুরু করে, তখন বাবা নিজের হাতে তা দমন করেন এবং নিজের শক্তি প্রদান করে, তাকে অহংকারশূণ্য করে চরম লক্ষ্যের প্রাপ্তি করিয়ে দেন। সে পরম সন্তুষ্ট হয়ে অক্ষয় সুখের অধিকারী হয়ে যায়। **যে বাবাকে একনিষ্ঠভাবে নমন করে তাঁর শরণে যায়, তার আর অন্য কোন সাধনার আবশ্যকতা থাকে না। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সে সহজেই পেয়ে যায়।** ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার চারটি মার্গের (কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি) মধ্যে ভক্তি মার্গ সবচেয়ে বেশী কন্টকাকীর্ণ এবং খানাখন্দরে ভরা। কিন্তু যদি সদ্‌গুরুর উপর বিশ্বাস থাকে এবং পথের গহ্বর থেকে সাবধান হয়ে তাঁর পদানুসরণ করে সোজা এগিয়ে যাও, তাহলে সেই চরম লক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট সহজেই পৌঁছে যাবে। শ্রী সাইবাবা বলেছেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম এবং তাঁর বিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষণ ও লয় করার বিভিন্ন শক্তিগুলির পৃথকত্বর মধ্যেও একাত্মতা আছে। এই কথাটি বিভিন্ন গ্রন্থকাররাও লিখেছেন। ভক্তদের কল্যাণের জন্য শ্রী সাইবাবা স্বয়ং যে আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা হল **"আমার ভক্তদের বাড়ীতে অন্ন-বস্ত্রের কখনো অভাব হবে না। আমার বৈশিষ্ট্য এই যে, যে ভক্ত আমার শরণে আসে এবং কায়মনোবাক্যে আমারই উপাসনা করে, তাঁর কল্যাণের জন্য আমি সর্বদা চিন্তিত থাকি ।** কৃষ্ণ ভগবান

গীতাতে এই কথাই বুঝিয়েছেন- সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ - (গীতা **১৮/৬৬)**। তাই খাওয়া-পরার কথা বেশী চিন্তা কোরো না। যদি কিছু চাইবার অভিলাষ থাকে তাহলে ঈশ্বরকেই চেয়ে নাও। জাগতিক সম্মান বা উপাধি ছেড়ে, ঈশ্বরের কৃপা ও অভয়দান প্রাপ্ত করো এবং তাঁর দ্বারাই সম্মানিত হওয়ার চেষ্টা করো। সাংসারিক সাধনায় বিপথগামী হয়ো না। **নিজের ইষ্টকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো। অন্য কোন পদার্থে আকর্ষিত হয়ো না, সর্বদা আমার ধ্যানেই মন নিযুক্ত রাখো যাতে সে দেহ, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি প্রবৃত্ত না হয়।** এইভাবে চিত্ত স্থির, শান্ত ও নির্ভয় হয়ে যাবে। এই ধরনের মনঃস্থিতি ইঙ্গিত দেয় যে, মন সুসঙ্গতিতে আছে। যদি মনের চঞ্চলতাই দূর না হয়, তাহলে তাকে একাগ্র করা যায় না।"

এরপর গ্রন্থকার শিরডীতে রামনবমী উৎসব বর্ণনা করেছেন। শিরডীতে রামনবমী খুব ঘটা করে পালন করা হয় এবং এটি সেখানকার প্রধান উৎসব। অতএব এই উৎসবের সম্পূর্ণ বিবরণ, যেমনটি সাইলীলা পত্রিকার **(১৯২৫) ১৯৭** পৃষ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল, নিম্নে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে ঃ-

প্রারম্ভ

কোপরগ্রামে শ্রী গোপালরাও গুন্ড নামে এক ইনস্‌পেক্টর থাকতেন এবং উনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রী সাইবাবার কৃপায় উনি একটি পুত্র রত্ন প্রাপ্ত করেন (ওঁর তিনটি স্ত্রী ছিল, কিন্তু তখনো অবধি কোন সন্তান হয়নি)। সেই আনন্দে **১৮৯৭** সালে ওঁর মনে হয় যে শিরডীতে মেলা অথবা উর্স ভরানো উচিত (উর্স শিরডীবাসীদের

নিজেদের গ্রামদেবীর চরণে শ্রদ্ধা অর্পণ করার অনুষ্ঠান)। উনি এই কথাটি অন্যান্য ভক্তদের, যেমন- তাত্য়া পাটীল ও মাধবরাওকেও বলেন। ওঁদের সবারই এই পরিকল্পনাটি খুব ভালো লাগে এবং ওঁরা শীঘ্রই বাবার অনুমতি ও আশ্বাসও পেয়ে যান। এইবার কালেক্টরের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি আপত্তি করায়, স্বীকৃতি পাওয়া গেল না। কিন্তু বাবা তো আগেই আশ্বাস দিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব আবার চেষ্টা করাতে, স্বীকৃতি পাওয়া গেল। বাবার আদেশ অনুসারে রামনবমীর দিন মেলা হওয়া (বা উর্স ভরা) স্থির হয়। পরবর্তীকালের ঘটনাগুলি দেখে মনে হয় যে, বাবা যেন কোন একটা বিশেষ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করে এরকম আদেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ উর্স এবং রামনবমী উৎসবের একীকরণ এবং হিন্দু-মুসলিম একতা। এই বিশেষ ব্যবস্থাটি চমৎকার ভাবে সফল হয়।

প্রথম বাধা তো কোন রকমে কাটল। এবার দ্বিতীয় সমস্যার (জলের অভাব) সম্মুখীন হতে হল। সে সময়, শিরডী একটি ছোট্ট গ্রাম ছিল এবং বরাবরই সেখানে জলের অকুলান থাকত। গ্রামে শুধু দুটোই কূয়ো ছিল। তার মধ্যে একটা তো প্রায় শুকিয়েই গিয়েছিল ও অন্যটার জল ছিল নোন্তা। বাবা তাতে ফুল ঢেলে, তার জল মিষ্টি করে দিলেন। কিন্তু একটা কূয়োর জল কতজনের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে? তাই তাত্য়া পাটীল বাইরে থেকে জল আনবার ব্যবস্থা করলেন। বাঁশের ও কাঠের দোকান বানানো হল। কুস্তিরও আয়োজন করা হলো। গোপালরাও গুন্ডের এক বন্ধু দামু আন্না কাসার আহমদনগরে থাকতেন। তিনিও সন্তানহীন হওয়ার দরুণ মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। শ্রী সাইবাবার কৃপায় উনিও সন্তান সুখ প্রাপ্ত করেন। শ্রী গুন্ড ওঁকে এই উপলক্ষে একটা ধ্বজা দিতে বলেন। একটা ধ্বজা জমিদার শ্রী নানাসাহেব নিমোন্কর দেন। এই দুটি ধ্বজা খুব ধুমধাম করে গ্রামের

বাইরে মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হলো এবং শেষে মস্জিদের (যাকে বাবা দ্বারকামাই বলে ডাকতেন) কোণে লাগিয়ে দেওয়া হলো। এই সমারোহটি এখনো আগের মতই চলছে।

চন্দন সমারোহ

এই মেলাতে আরেকটি সমারোহও শুরু হয়, যেটি চন্দনোৎসব নামে প্রসিদ্ধ। এর পরিকল্পনা কোরহলের এক মুসলমান ভক্ত শ্রী আমীর শক্কর দালাল করেন। এই ধরনের উৎসব সাধারনতঃ সিদ্ধ মুসলমান সন্তদের সম্মানে করা হয়। অনেকটা চন্দন ঘষে, অনেকগুলি চন্দন ধূপ থালাতে জ্বালিয়ে, মিছিল বার করা হত। সব শেষে মস্জিদে এইগুলি পৌঁছিয়ে সমারোহ শেষ হয়ে যেত। থালার চন্দন এবং ধূপ নিমের গাছের এবং মস্জিদের দেওয়ালের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হত। এই উৎসবের ব্যবস্থা প্রথম তিন বছর আমীর শক্কর করেন। তারপর তাঁর স্ত্রী এর ভার নেন। এইভাবে হিন্দুদেরদ্বারা ধ্বজার ও মুসলমানদের দ্বারা চন্দনের শোভাযাত্রা এক সাথে বেরোত এবং আজ অবধি সেইভাবেই বেরোয়।

প্রবন্ধ

রামনবমীর দিনটি শ্রী সাইবাবার ভক্তদের জন্য অতিশয় প্রিয় ও পবিত্র। মেলায় সহযোগিতা ও কাজ করার জন্য অনেক লোক প্রস্তুত থাকত। বাইরের সমস্ত কাজ শ্রী তাত্য়া পাটীল ও বাকী কাজগুলি শ্রী সাইবাবার এক পরম ভক্ত রাধাকৃষ্ণমাই সামলাতেন। এই সময় ওঁর বাড়ী অতিথিতে ভরে যেত এবং উনি সবার আরামের প্রতি নজর রাখতেন। মেলায় প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষ জোগাড় করে রাখতেন। ওঁর আরেকটা কাজ ছিল, যেটা তিনি সানন্দে করতেন- সেটা হলো মস্জিদটিকে পরিস্কার ও চুণকাম করা। মস্জিদের মেঝে ও দেওয়াল,

ধুনির ধোঁয়াতে কালো হয়ে যেত। যে সময় বাবা চাওড়ীতে বিশ্রাম করতে যেতেন, সেই সময় রাধাকৃষ্ণমাই মস্‌জিদ পরিস্কার করে নিতেন। সমস্ত জিনিষগুলি, ধুনি সমেত, বাইরে বার করতে হতো। পরিস্কার ও চুনকামের কাজ হয়ে যাওয়ার, পর আবার সেগুলি সাজিয়ে দিতেন।

এই উৎসবের একটা প্রধান অংশ ছিল গরীবদের খাওয়ান- বাবার খুবই প্রিয় অনুষ্ঠান। এর জন্য বিরাট ভোজের আয়োজন করা হতো এবং নানা রকমের মিষ্টান্ন তৈরী করা হতো। এই সমস্ত ব্যবস্থা, রাধাকৃষ্ণমাইয়ের বাড়ীতে ওঁর তত্ত্বাবধানেই করা হতো। অনেক ধনী ভক্তরা এই কাজের জন্য টাকা দিতেন।

উর্স ও রামনবমীর উৎসবের সমন্বয়

সব ব্যবস্থা ও কাজ এভাবে খুব ভালো করেই চলছিল ও মেলার প্রসিদ্ধিও ধীরে-ধীরে বাড়ছিল। **১৯১১** সালে একটা পরিবর্তণ ঘটে। এক ভক্ত, শ্রীকৃষ্ণরাও জোগেশ্বর ভীষ্ম (শ্রী সাই সগুনোপসনার লেখক) শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডের সঙ্গে মেলার একদিন আগে দীক্ষিত ওয়াড়ায় এসে উঠলেন। এক সময় বারান্দায় শুয়ে-শুয়ে, ওঁর একটা কথা মনে হয়। ঠিক সেই সময় কাকা মহাজনী পূজোর সামগ্রী নিয়ে মস্‌জিদের দিকে যাচ্ছিলেন। ওঁদের মধ্যে কিছু আলোচনা হয় এবং তাতে বোঝা যায় যে মেলা ঠিক রামনবমীর দিনই হওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। রামনবমীর দিনটি হিন্দুদের জন্য খুবই প্রিয়। এই দিনে যদি রামনবমী উৎসবও (অর্থাৎ শ্রী রামের জন্মের) শুরু করে দেওয়া হয় তো কেমন হয়? কাকা মহাজনীর এই পরিকল্পনাটি খুব ভাল লাগে। এখন শুধু বাকী রইল একটি হরিদাস খোঁজা- যে এই উপলক্ষে হরিকীর্তন ও ঈশ্বর গুণগান করতে

পারে। এই বাধাটাও কেটে গেল, যখন ভীষ্ম বললেন- "আমার স্বরচিত রাম আখ্যান' যাতে রামজন্মের বর্ণনা আছে, লেখা হয়ে গেছে। আমি তারই কীর্তন করব এবং তুমি হারমোনিয়াম বাজাবে। রাধাকৃষ্ণমাঈ 'সুন্থাবড়া'র (আদা ও চিনির মিশ্রণ) প্রসাদ তৈরী করে দেবেন।" এইসব আলোচনার পর ঐ দুজনে বাবার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য মস্‌জিদে গেলেন। বাবা তো অন্তর্যামী। তিনি তো সবই জানতেন যে, কি কথাবার্তা হচ্ছিল। তিনি মহাজনীকে জিজ্ঞাসা করলেন- "দীক্ষিত ওয়াড়াতে কি সব চলছিল?" এই আকস্মিক প্রশ্ন শুনে, মহাজনী একটু ঘাবড়ে যান। বাবার কথার অভিপ্রায় না বুঝতে পারার দরুণ, উনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন বাবা ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন- "কি ব্যাপার?' ভীষ্ম তখন রামনবমী উৎসবের প্রস্তাবটা বাবার সামনে রাখেন ও বাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সেটা বাবাও সন্তুষ্ট হয়ে দিয়ে দেন। সব ভক্তরাই খুব খুশী হয় এবং রামজন্মোৎসবের তোড়-জোড় শুরু হয়ে গেল। পরের দিনই নানা রঙের পতাকা দিয়ে মস্‌জিদ সাজিয়ে দেওয়া হলো। শ্রীমতী রাধাকৃষ্ণমাঈর থেকে একটা দোলনা আনিয়ে, বাবার সামনে রাখা হল। এর পর উৎসব শুরু হলো। ভীষ্ম কীর্তন গাইতে শুরু করেন ও মহাজনী তার সাথে হারমোনিয়াম বাজান। ঠিক এই সময় বাবা মহাজনীকে ডেকে পাঠান। মহাজনী একটু শঙ্কিতবোধ করেন যে, বাবা বোধ হয় উৎসবের অনুমতি দেবেন না। কিন্তু উনি যখন বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ান, তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন- "এসব কি? এই দোলনাটা এখানে কেন রাখা হয়েছে?" মহাজনী তাঁকে জানান যে, রামনবমীর উৎসব শুরু হয়ে গেছে এবং তাই দোলনাটা সেখানে রাখা হয়েছে। বাবা দুটো মালা নিয়ে একটা কাকাজীর গলায় পরিয়ে দেন এবং অন্যটা ভীষ্মর জন্য পাঠিয়ে দেন। এবার আবার কীর্তন

শুরু হল। কীর্তন শেষ হলে, শ্রী রাজারামের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়ে ওঠে। কীর্তনের জায়গায় আবীর ওড়ানো হলো। সবাই আনন্দে মত্ত ছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা গর্জন শোনা গেল। যে সময় আবীর ছোঁড়া হচ্ছিল, একটু আবীর বাবার চোখে হঠাৎ চলে যায়। বাবা তাতে ভীষণ রেগে উঠেন এবং জোরে-জোরে গালি দিতে শুরু করেন। এই দৃশ্য দেখে সবাই ভয়ে এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যারা বাবার স্বভাব ভালভাবে জানত, তারা এই অপশব্দ শুনে ভয়ভীত হবে কেমন করে? বাবার এই রাগ ও অপশব্দ তারা আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করলো। তাদের মনে হলো- "আজ রামের জন্মদিনে অর্থাৎ রাবনের বিনাশ, অহংকার ও দুষ্ট প্রবৃত্তি রূপী রাক্ষসদের সংহার করার জন্য বাবার ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক।" এছাড়া তারা এও জানত যে যখনই শিরডীতে কোন নতুন কাজ শুরু করা হতো, তখন বাবা এইরকমই রেগে যেতেন। তাই তারা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এদিকে রাধাকৃষ্ণমাঈ ভয় পাচ্ছিলেন যে, বাবা রাগের চোটে দোলনাটাই না ভেঙ্গে ফেলেন। তাই তিনি মহাজনীকে দোলনাটা সরিয়ে নিতে বললেন। কিন্তু বাবা কাকাজীকে তা করতে দিলেন না। কিছুক্ষণ পর বাবা শান্ত হন। সেইদিনের মহাপূজো ও আরতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। এরপর কাকা মহাজনী দোলনাটি সরিয়ে নেবার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান। কিন্তু বাবা বললেন- "উৎসব এখনও শেষ হয়নি।" পরের দিন গোপালকালা উৎসবের পর বাবা দোলনাটি নামাবার অনুমতি দেন। একটা মাটির পাত্রে দৈ-চিঁড়ে রেখে সেটা টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো। কীর্তন শেষ হওয়ার পর পাত্রটি ভেঙ্গে দৈ-চিড়ে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হল, যেমনটি শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে করেছিলেন। রামনবমীর উৎসব এইভাবে সারা দিন ধরে চলল। দিনের বেলা দুটো ধ্বজার শোভাযাত্রা ও রাত্রিতে চন্দনের মিছিল খুব ঘটা

করে বেরোল। এরপর 'উর্স' রামনবমীর উৎসবে রূপান্তরিত হল। পরের বছর **(১৯১২)** থেকে উৎসবের ঘটা ও কার্য্যক্রমগুলো বাড়তে লাগল। শ্রীমতি রাধাকৃষ্ণমাঈ চৈত্র প্রতিপদ থেকে 'নাম সপ্তাহ' আরম্ভ করে দিলেন (দিন রাত অনবরত সাত দিন ধরে ভগবৎ নাম নেওয়াকে নাম সপ্তাহ বলে)। সব ভক্তরা পালা করে এতে অংশ গ্রহণ করতেন। দেশের সব জায়গাতেই রামনবমীর উৎসব পালন করা হয়। তাই পরের বছর আবার হরিদাসের ব্যবস্থা করা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু উৎসবের দিনের আগেই, তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া গেল। পাঁচ-ছদিন আগে হঠাৎ শ্রী মহাজনীর বালা বুয়ার সাথে দেখা হয়। বুয়া সাহেব 'আধুনিক তুকারাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হরিকীর্তন করার দায়িত্ব তাঁর উপরেই দেওয়া হল। তার পরের বছরও ওঁর গ্রামে প্লেগ ছড়ানোর দরুণ, তিনি নিজের গ্রামে হরিদাসের কাজ করতে না পারায়, শিরডীতে চলে আসেন। কাকাসাহেব দীক্ষিত ওঁকে কীর্তনের ভার দেওয়ার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চান। বাবা অনুমতির সাথে-সাথে বুয়াকে যথেষ্ট পুরস্কারও দেন। **১৯১৪** সালে বাবা হরিদাসের সমস্যাটি পুরোপুরি মিটিয়ে দেন। তিনি এই কাজটির ভার দাসগণু মহারাজকে দেন। সেই থেকে দাসগণু মহারাজ এই কাজটি অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পালন করেন। **১৯১২** থেকে উৎসবে ভক্তদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। নামকরা পালোয়ানদের কুস্তি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। গরীবদের জন্য খুব বড় ভাবে খাওয়ার আয়োজন করা হতো। রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের ঘোর পরিশ্রমের ফলে, শিরডী সংস্থানের রূপ অর্জন করল। সংস্থানের সম্পত্তিও দিন-দিন বাড়তে লাগল। একটা সুন্দর ঘোড়া, পাল্কী, রথ এবং রূপোর অন্যান্য জিনিষ ও বাসন-পত্র ইত্যাদি ভক্তরা উপহার রূপে অর্পণ করতেন। এই অবসরে হাতিও ডাকা হতো। যদিও সম্পত্তিতে দিনের-পর-দিন

বৃদ্ধি হচ্ছিল, বাবা সে সব থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকতেন। তিনি এই সব জিনিষ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সব সময় সাধারণ বেশভূষা ধারণ করে থাকতেন। মিছিল এবং উৎসবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কাজ করত, কিন্তু আজ অবধি, তাদের মধ্যে কোন বিবাদ বা মতভেদ ঘটেনি - এই কথাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম-প্রথম লোকেদের সংখ্যা পাঁচ-সাত হাজারই হত। কিন্তু পরের দিকে এই সংখ্যা পঁচাত্তর-আশী হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। আজকাল তো এইদিন লক্ষাধিক ভক্তরা শিরডীতে সম্মিলিত হয়। তবুও আজ অবধি, না তো কোন রোগ, আর নাই কোন ঝগড়া দেখা দিয়েছে।

মস্‌জিদের জীর্ণতা সংস্কার

'উর্স' ভরার (মেলা শুরু করার) বিচারটি যেমন সর্বপ্রথম শ্রী গোপালরাও গুন্ডের মাথায় জাগে ঠিক তেমনিই মস্‌জিদের জীর্ণসংস্কারের পরিকল্পনাও তাঁর মাথাতেই আগে আসে। এই কাজের জন্য তিনি পাথর একত্রিত করান ও তা চৌকোণো করান। কিন্তু এই কাজের খ্যাতি তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল না। সেটি নানাসাহেব চাঁদোরকরের ভাগে পড়ে ও মেঝে বানানোর নাম কাকাসাহেব দীক্ষিত পান। প্রথমে বাবা এই কাজের জন্য অনুমতি দেননি। কিন্তু স্থানীয় ভক্ত মহালসাপতির প্রয়াসে, স্বীকৃতি পাওয়া যায় এবং এক রাত্তিরেই মেঝে তৈরী হয়ে যায়। তখন অবধি বাবা একটা ছালার টুকরোর উপরে বসতেন। এবার এই ছালার টুকরোটি সরিয়ে, সেখানে একটা ছোট গদী রাখা হলো। মস্‌জিদের উঠোনটা খুব ছোট্ট ও অসুবিধেজনক ছিল। কাকাসাহেব দীক্ষিত সেটা বাড়িয়ে তার উপর ছাত নির্মাণ করতে চাইলেন। যথেষ্ট দ্রব্য, বাঁশ ইত্যাদি কিনে আনা হল। কাজও শুরু হয়ে গেল। দিনরাত পরিশ্রম করে, ভক্তরা লোহার শিকগুলি মাটিতে গাঁথল। পরের দিন চাওড়ী থেকে ফেরার পর, বাবা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিলেন ও

ভীষণ রেগে গেলেন। তাত্‌য়ার মাথার কাপড়টা খুলে, তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন। রাগে বাবার চোখ দুটি লাল হয়ে উঠল। কারো তাঁর দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছিল না। সবাই ভাবছিল এইবার কি যে হবে? ভাগোজী শিন্দে (বাবার এক পরম ভক্ত যিনি কুষ্ঠ রোগে ভুগছিলেন) একটু সাহস করে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু বাবা তাঁকেও ধাক্কা দিয়ে পিছনে করে দিলেন। মাধবরাও-এরও ঐ একই দশা হলো। বাবা ওঁর উপরে ঢিল-পাট্‌কেল ছুঁড়তে শুরু করেন। যে-ই ওঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে যায়, তার ঐ দশাই হয়। কিছুক্ষণ পর যখন বাবার রাগ শান্ত হয়, তখন বাবা একটি দোকানদারকে ডেকে, একটা জরির কাপড় কিনে, নিজের হাতে তাত্‌য়ার মাথায় বেঁধে দেন, যেন তাকে কোন বিশেষ সম্মান দ্বারা অলংকৃত করা হলো। এই বিচিত্র ব্যবহারটি দেখে, সেখানে উপস্থিত সবারই খুব আশ্চর্য লাগে। ওরা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, বাবা কোন অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ রেগে উঠলেন। তিনি তাত্‌য়াকে কেনই বা মারলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রাগ কিভাবে আপনা আপনি শান্ত হয়ে গেল? বাবা প্রায়ই গম্ভীর ও চুপচাপ থাকতেন এবং খুবই প্রেমপূর্বক কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু কখনো-কখনো অনায়াসেই ও বিনা কারণে রেগে উঠতেন। এই ধরনের অনেক ঘটনা দেখেছি, কিন্তু আমি এটা স্থির করতে পারছিনা যে তাদের মধ্যে কোন্‌টা লিখি আর কোন্‌টা ছাড়ি। তাই ঘটনাগুলি যেমন-যেমন মনে পড়ছে সেভাবেই বর্ণনা করব। পরবর্তী অধ্যায়ে বাবা হিন্দু ছিলেন না মুসলমান- এই বিষয়ের বিবরণ পাঠকগণ শ্রবণ করবেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ প্রথম বিশ্রাম

অধ্যায় - ৭

অদ্ভুত অবতার, শ্রী সাইবাবার প্রকৃতি, তাঁর যোগক্রিয়া, কুষ্ঠ রোগীর সেবা, খাপার্ডের ছেলের প্লেগ, পন্ঢরপুর যাত্রা।

যদি বলা হয় যে, শ্রী সাইবাবা হিন্দু ছিলেন, তাহলে কিন্তু তাঁকে দেখলে মুসলমান বলেই মনে হতো। কেউ নিশ্চিত হয়ে আজ পর্যন্ত বলতে পারেনি যে, তিনি হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান। তিনি হিন্দুদের রামনবমীর উৎসব যথাবিধি পালন করতেন এবং তার সাথে-সাথে চন্দনোৎসবও। এই উৎসব উপলক্ষে যথেষ্ট পুরস্কারও দিতেন। গোকুল অষ্টমীতে তিনি গোপাল কালা সমারোহও খুব ঘটা করে পালন করতেন। 'ঈদ'- এর দিন তিনি মুসলমানদের মস্‌জিদে 'নমাজ' পড়বার জন্য আমন্ত্রিত করতেন। এক সময় 'মহরম উপলক্ষে কিছু মুসলমান 'তাজিয়া' বানিয়ে কিছুদিন মস্‌জিদে রেখে তারপর সেটা নিয়ে মিছিলে বেরোবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। শ্রী সাইবাবা কেবল চারদিন তাজিয়াটি মস্‌জিদে রাখতে দেন, এবং পঞ্চমদিন কোন হৈ-হল্লা না করে সেটি ওখান থেকে সরিয়ে নিতে বলেন।

যদি বলা হয় যে, তিনি মুসলমান ছিলেন, তাহলে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে হিন্দুদের মতন তাঁর কানে ফুটো ছিল। যদি কেউ তাঁকে হিন্দু বলে ঘোষণা করে, তাহলে এও সত্য যে তিনি সদা মস্‌জিদেই থাকতেন এবং যদি মুসলমান বলা হয়, তাহলে তিনি সর্বদা 'ধুনি' প্রজ্জ্বলিত রাখতেন। এমন অনেক কর্ম যেগুলি ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে- যেমন যাঁতা পেষা, শাঁখ বাজানো, ঘন্টাদি, হোম, অন্নদান

ও অর্ঘ্য দ্বারা পূজো করা ইত্যাদি, সবসময়ই সেখানে হতো। নানাসাহেবের (যিনি বাবার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন) মতে, বাবার নিজের ছুন্নৎ ছিল না ("বাবা হিন্দু না যবন"; প্রবন্ধ-বি.ভি. দেব)।

এরপরও যদি কেউ বলে যে, তিনি মুসলমান ছিলেন তো কুলীন ব্রাহ্মণ ও অগ্নিহোত্রীরাও নিজেদের নিয়ম উল্লংঘন করে সদা তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেন। যারা বাবার জন্মস্থান বা স্বদেশ খোঁজ করতে গিয়েছিল, তারা নিজেদের প্রশ্ন ভুলে, তাঁর দর্শনমাত্রেই অভিভূত হয়ে পড়ত। অতএব আজ পর্যন্ত কেউ নির্ণয় করতে পারেনি যে, বাবা হিন্দু ছিলেন, না মুসলমান। এতে আশ্চর্য্য হওয়ারই বা কি আছে? যিনি অহং ও ইন্দ্রিয়সুখগুলিকে জলাঞ্জলি দিয়ে, ঈশ্বরের শরণে চলে গেছেন এবং ঈশ্বরের সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে, তার আর কোন জাত পাত থাকে না। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি জাতি বা প্রাণীদের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র ভেদ করতেন না। ফকিরদের সঙ্গে তিনি আমিষ আর মাছও খেয়ে নিতেন। কুকুররাও ওর খাবার পাত্র থেকে মহানন্দে খেতো, তিনি কিন্তু কখনো কোন আপত্তি করতেন না। এমনি অপূর্ব ও অদ্ভুত অবতার ছিলেন শ্রী সাইবাবা। গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপ, তাঁর শ্রীচরণে বসে তাঁর সৎসঙ্গের সুখ উপভোগ করার সৌভাগ্য আমারও হয়। আমি যে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করেছিলাম, সেটা কিভাবে বর্ণনা করতে পারি? যথার্থে বাবা ছিলেন অখন্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাঁর মহান ও অদ্বিতীয় চরিত্র কেই বা বর্ণনা করতে পারে? তাঁর শ্রীচরণের আশ্রয় নিয়ে ভক্তরা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। অনেক সন্ন্যাসী সাধক ও মুমুক্ষুজন তাঁর দর্শন করতে আসতেন। বাবাও তাঁদের সাথে উঠতেন-বসতেন, চলতেন ফিরতেন, তাঁদের সঙ্গে কথা-বার্তা বলে ওঁদের

চিত্তরঞ্জন করতেন। 'আল্লাহ মালিক' সর্বদাই তাঁর মুখে লেগে থাকত। তিনি কখনো বিবাদ বা তর্কাতর্কিতে যেতেন না এবং সবসময় শান্ত ও স্থির থাকতেন। কিন্তু কখনো-কখনো তিনি রেগেও যেতেন। লোকেদের বেদান্তর শিক্ষা দিতেন। কেউ শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি যে, শ্রী সাইবাবা কে ছিলেন? গরীব হোক বা বড়লোক - সবাই তাঁর কাছে সমান। তিনি সবার গোপনীয় খবর জানতেন এবং যখন তাদের সামনে সেই রহস্য প্রকাশ করে দিতেন, তখন তারা অবাক হয়ে যেত। স্বয়ং জ্ঞানাবতার হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সর্বদা অজ্ঞানেরই ভান করতেন। তাঁর মান সম্মানের আড়ম্বর ভালো লাগত না। এইরূপ ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি শরীরধারী হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কর্ম তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দেয়। শিরডীর নর - নারীরা তাঁকে পরমব্রহ্ম স্বরূপ মানত।

বিশেষ ঃ-

(১) শ্রী সাই বাবা তাঁর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত মহালসাপতিকে (যিনি বাবার সঙ্গে মস্‌জিদে ও চাওড়ীতে শুতেন) বলেছিলেন- "আমার জন্ম পাথর্ডীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হয়েছিল। আমার বাবা-মা আমাকে বাল্য অবস্থাতেই, এক ফকিরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।" যে সময় এরকম কথাবার্তা হচ্ছিল, পাথর্ডী থেকে কিছু লোক সেখানে এসে পৌঁছায়। বাবা তাদের কাছে পাথর্ডীর কিছু লোকেদের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীমতি কাশীবাঈ কানেট্‌কর (পুণার এক প্রসিদ্ধ বিদূষী মহিলা) নিজের অভিজ্ঞতায় লেখেন- 'বাবার চমৎকারের কথা শুনে, আমরা নিজেদের ব্রহ্মবাদী সংস্থার পদ্ধতির অনুসারে বিবেচনা করছিলাম। বিবাদের বিষয় ছিল যে, শ্রী সাইবাবা ব্রহ্মবাদী না বাম্মার্গী। পরে যখন আমি শিরডী যাই, তখন এ সম্বন্ধে আমার মনে নানারকমের

প্রশ্ন উঠছিল। মস্‌জিদের সিঁড়িতে পা দিতেই, বাবা উঠে আমার সামনে এসে, নিজের বুকের (হৃদয়) দিকে সংকেত করে, আমার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় স্বরে বলেন- "এইটি ব্রাহ্মণ, শুদ্ধ ব্রাহ্মণ। এর বাম্‌মার্গের সাথে কি প্রয়োজন? এখানে কোন মুসলমান প্রবেশ করার দুঃসাহস করতে পারে না এবং করাও উচিত নয়। এই ব্রাহ্মণ লক্ষ-লক্ষ মানুষের পথ প্রদর্শন করতে এবং তাদের অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি করাতে সক্ষম। এটা ব্রাহ্মণের মস্‌জিদ। আমি এখানে কোন বাম্মার্গীর ছায়াও পরতে দেব না।"

বাবার প্রকৃতি ঃ-

আমার মত মূর্খ, শ্রী সাইবাবার অদ্ভুত লীলার বর্ণনা করতে পারবে না। শিরডীর প্রায় সব ক'টি জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার বাবাই করিয়েছিলেন। শ্রী তাত্‌য়া পাটীলকে দিয়ে শনি, গণপতি, শিব-পার্বতী, গ্রামদেবতা ও হনুমানজীর মন্দির মেরামত করান। তাঁর দানও বিলক্ষণ ছিল। দক্ষিণা রূপে যে টাকা একত্রিত হত, তার মধ্যে থেকে কাউকে কুড়ি টাকা, তো কাউকে পনেরো টাকা বা কাউকে পঞ্চাশ টাকা প্রতি দিন স্বচ্ছন্দে বিতরণ করতেন। যারা সেই টাকা পেতো, তারা এটিকে শুদ্ধ দান মনে করতো। বাবাও সর্বদা চাইতেন যে, সেটি উপযুক্ত রূপে খরচ করা হোক। বাবার দর্শন করে ভক্তরা অনেক ভাবে লাভবান হতো। অনেকে নিষ্কপট ও সুস্থ হয়ে যেত, দুষ্টাত্মা পুণ্যাত্মায় পরিণত হয়ে যেত, অনেক কুষ্ঠ রোগী মহারোগ হতে মুক্তি পেয়েছে এবং অনেকে তাদের মনোবাঞ্ছিত ফল পেয়ে সুখী হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রীরা শিরডীতে আসতে শুরু করে। বাবা সব সময় ধুনির কাছেই বসতেন এবং ওখানেই বিশ্রাম করতেন। তিনি কোন-কোন দিন স্নান করতেন, আবার কখনো-কখনো দিনের পর দিন

স্নান না করেই সমাধিতে লীন থাকতেন এবং দেহ ঢাকবার জন্য একটা 'আঙরাখা' পরে থাকতেন। তাঁর বেশভূষা শুরু থেকেই এরকম ছিল। জীবনের প্রথম দিকে তিনি গ্রামে লোকের চিকিৎসাও করতেন। রোগীদের ওষুধ দিয়ে তাদের সুস্থ করে দিতেন। তাঁর অপরিমিত হাতযশ ছিল। তাই খুব কম সময়ের মধ্যেই, তিনি ধন্বন্তরি রূপে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। এখানে শুধু একটাই বিচিত্র ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

চোখের বিলক্ষণ চিকিৎসা ঃ-

একটি ভক্তের চোখ অত্যধিক লাল হয়ে ফুলে উঠেছিল। শিরডীর মতো একটা ছোট্ট গ্রামে ডাক্তার কোথায়? তখন সবাই রোগীকে বাবার কাছে নিয়ে এলো। এই ধরনের ব্যাধিতে ডাক্তারেরা সাধারণতঃ প্রলেপ, মলম, কাজল, গরুর দুধ বা কর্পূর ওষুধ রূপে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বাবার ঔষধি ত একেবারেই ভিন্ন ছিল। তিনি কিছু 'ভেলা'-র বিচী (bibba seeds) পিষে তার দুটো গুলি বানিয়ে রোগীর চোখে এক-একটা গুলি চেপে দিয়ে কাপড়ের পট্টী বেঁধে দিলেন। পরের দিন পট্টী সরিয়ে চোখে জলের ছিটে দেওয়া হলো। ফোলা ভাবটা কমে গিয়েছিল এবং চোখ প্রায় নিরোগ। চোখ শরীরের একটা এত কোমল অঙ্গ অথচ বাবার ওষুধে, চোখের কোনরকম ক্ষতি হয় না বরং চোখের কষ্ট দূর হয়ে যায়। এইভাবে অনেক রোগী নিরোগ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এই ঘটনাটি এখানে উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হলো।

বাবার যৌগিক ক্রিয়া ঃ-

বাবা সমস্ত যৌগিক ক্রিয়া জানতেন। তার মধ্যে শুধু দুটিরই উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

১) নাড়ি-ভুঁড়ি স্বচ্ছ করার ক্রিয়া (dhoti-poti)- প্রত্যেক তৃতীয় দিন বাবা মস্‌জিদ থেকে খানিকটা দূরে একটা বট গাছের নীচে করতেন। একবার লোকেরা দেখে যে তিনি নিজের নাড়ি-ভুঁড়ী পেট থেকে বার করে, ভালোভাবে পরিস্কার করে, কাছের জাম গাছে শুকোবার জন্যে রেখে দিয়েছেন। শিরডীতে এখনো এমন কয়েকজন লোক বেঁচে আছেন, যাঁরা এই ঘটনাটির সাক্ষী দিতে পারেন। ওঁরা এর সত্যতাও পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণতঃ এই ক্রিয়াটি যেভাবে করা হয়, তার থেকে বাবার ক্রিয়াটি বিচিত্র ও আলাদাই ছিল।

২) খন্ডযোগ - একবার বাবা নিজের অঙ্গপ্রতঙ্গ পৃথক-পৃথক করে মস্‌জিদের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। হঠাৎ ঐ দিনই, এক মহাশয় মস্‌জিদে আসেন এবং শরীরের অঙ্গগুলিকে এদিক-ওদিক ছড়ানো দেখে, খুবই ভয় পেয়ে যান। প্রথমে ওঁর মনে হয় যে, গ্রামাধিকারীকে এই খবরটি দেওয়া উচিত যে বাবাকে কেউ খুন করে তাঁকে টুকরো-টুকরো করে, কেটে দিয়েছে। কিন্তু প্রথম বার্তাবাহকই সাধারণতঃ ধরা পড়ে, এই কথা ভেবে সে কোন রকম উচ্চবাচ্য করল না। পরের দিন মস্‌জিদ পৌঁছে, বাবাকে আগের মতনই হৃষ্ট-পুষ্ট ও সুস্থ দেখে ওর খুবই আশ্চর্য্য লাগে। ওঁর মনে হয়- "গতকালের ঘটনাটি কি তাহলে স্বপ্ন ছিল?" বাবা ছোটবেলা থেকেই যৌগিক ক্রিয়া করতেন। তিনি কতখানি পারদর্শী হয়েছিলেন, সে কথা কেউ জানত না। চিকিৎসার নামে, তিনি কারো কাছ থেকে এক পয়সাও নিতেন না। তাঁর উত্তম, লোকপ্রিয় গুণের জন্য, তাঁর কীর্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অনেক গরীব রোগীদের সুস্থ করে দিয়েছিলেন। এই

সুবিখ্যাত বৈদ্যচূড়ামনি নিজের স্বাস্থের কথা চিন্তা না করে অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে এবং নিজে অসহ্য বেদনা ও কষ্ট সহ্য করে, সর্বদা অন্যদের উপকার করেছেন এবং তাদের বিপদে সাহায্য করেছেন। তিনি সব সময় পরকল্যাণার্থে চিন্তিত থাকতেন। নীচে লেখা একটা ঘটনা বাবার সর্বব্যাপকতা ও দয়ালুতা প্রমাণ করে।

বাবার সর্বব্যাপকতা ও দয়ালুতা ঃ-

১৯১০ সালে কালী পূজোর (দীপাবলী) শুভদিনে বাবা ধুনির কাছে বসেছিলেন। ধুনিতে কাঠ দিচ্ছিলেন ও হাত সেঁকছিলেন। ধুনি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বাবা কাঠের জায়গায় নিজের হাতটা ধুনিতে দিয়ে দেন। ফলতঃ হাতটা গুরুতর ভাবে জ্বলে যায়। শামা ও ভৃত্য মাধব বাবাকে জোর করে পেছনে টেনে নেন। মাধবরাও ব্যাকুল হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "দেব, আপনি এ কি করলেন? কেন করলেন?" বাবা এর উত্তরে জানান- "এখান থেকে একটু দূরে, এক কর্মকারের বৌ হাপর দিচ্ছিল। সেই সময় ওর বর ওকে ডাক দেয়। কোমরে বাঁধা শিশুর কথা ভুলে উঠতে গিয়ে, তার শিশুটি আগুনেপড়ে যায়। তাই আগুনে হাত দিয়ে শিশুটিকে বাঁচালাম। আমার হাত জ্বলে গেছে, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু একটি নির্দোষ শিশুর প্রাণ বেঁচে গেল, এটাই বড় কথা।

কুষ্ঠ রোগীর সেবা ঃ-

মাধবরাও দেশপান্ডের মাধ্যমে বাবার হাত জ্বলার সংবাদ পেয়েই শ্রী নানা সাহেব চাঁদোরকর বম্বের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রী পরমানন্দের সাথে ওষুধ, প্রলেপ এবং পট্টী ইত্যাদি নিয়ে শীঘ্রই শিরডী পৌঁছান।

উনি বাবাকে শ্রী পরমানন্দকে তাঁর হাতের চিকিৎসা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বাবা ওঁর এই প্রার্থনাটি প্রত্যাখ্যান করে দেন। এক কুষ্ঠ রোগী ভাগোজী শিন্দে রোজ হাতের পোড়া জায়গাটির উপর ঘি লাগিয়ে, তার উপর একটা পাতা রেখে শক্ত করে একটা পট্টি বেঁধে দিতেন। ক্ষতটি যাতে তাড়াতাড়ি সেরে যায়, সেই চিন্তায় নানাসাহেব বার-বার বাবাকে পট্টীটা খুলে দিতে ও শ্রী পরমানন্দকে চিকিৎসা করতে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। এমন কি ডাক্তারও কতবার তাকে মিনতি করেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই বাবা এই বলে মানা করে দিতেন- "ভগবানই আমার ডাক্তার।" বাবা হাত নিরীক্ষণ করার অনুমতি শেষ পর্যন্ত দেননি। ডাক্তার পরমানন্দের ওষুধ শিরডীতে খোলাই হল না এবং কোন কাজেও লাগতে পারেনি। তবুও শ্রী পরমানন্দ খুবই সৌভাগ্যশালী যে, তিনি বাবার দর্শন পান। কিছুদিন পর যখন ক্ষতটি ভরে যায়, তখন সব ভক্তরা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু বাবার হাতে একটু ব্যথা রয়ে গিয়েছিল কিনা, সেটা কেউ জানতে পারে নি। বাবার সমাধির দিন পর্যন্ত রোজ সকালে ভাগোজী বাবার হাতটি ঘি দিয়ে মালিশ করে তার উপর পট্টী বেঁধে দিতেন। শ্রী সাইবাবার মত সিদ্ধপুরুষের এইরূপ চিকিৎসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু ভক্তদের প্রেম পরবশ হয়ে তিনি ভাগোজীর এই সেবা (অর্থাৎ উপাসনা) স্বীকার করেন। যখনই বাবা লেন্ডীতে বেড়াতে যেতেন, ভাগোজী ছাতা নিয়ে বাবার পেছনে-পেছনে চলতেন। প্রতি দিন বাবা ভোরবেলা যখন ধুনির কাছে এসে বসতেন, ভাগোজী আগে থেকেই সেখানে উপস্থিত থাকতেন এবং নিজের কাজ অবিলম্বে শুরু করে দিতেন। ভাগোজী পূর্বজন্মে অনেক পাপকর্ম করেছিলেন। তাই ওঁকে কুষ্ঠ রোগে ভুগতে হয়। ওঁর আঙ্গুল গলে গিয়েছিল ও শরীর পুঁজে ভরে গিয়েছিল। শরীর থেকে দুর্গন্ধ বেরোত। এরূপ অবস্থায়

ওঁকে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক, কিন্তু বাবার প্রধান সেবক রূপে স্বীকৃত হওয়ায় উনিই আসলে বেশী ভাগ্যবান ও সুখী ছিলেন। উনি বাবার সান্নিধ্যের পূর্ণ লাভ প্রাপ্ত করেন।

বালক খাপর্ডের প্লেগ ঃ-

এবার আমি বাবার অন্য একটি লীলা বর্ণনা করব। শ্রীমতি খাপার্ডে (অমরাবতীর শ্রী দাদাসাহেব খাপার্ডের স্ত্রী) নিজের ছোট ছেলের সাথে বেশ কয়েক দিন ধরে শিরডীতে থাকছিলেন। হঠাৎ একদিন ছেলের খুব জ্বর হয় ও প্লেগের গিল্‌টী (গাঁট) বেরিয়ে আসে। শ্রীমতি খাপার্ডে খুব ভয় পেয়ে যান এবং অমরাবতী ফিরে যেতে উদ্যত হন। সন্ধ্যাবেলায় বাবা যে সময় বেড়াতে বেরোন, সেই সময় শ্রীমতী খাপার্ডে বাবার কাছে গিয়ে কম্পিত স্বরে বলেন- "আমার ছোট ছেলের প্লেগ হয়েছে তাই এবার আমি বাড়ী ফিরতে চাই।" বাবা দয়াদ্র স্বরে তাঁর সমস্যার সমাধান করে বলেন- "আকাশে খুব মেঘ করেছে। মেঘ সরে যেতেই আকাশ আবার আগের মতন স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।" এই বলে তিনি নিজের কফ্‌নীটা কোমর পর্যন্ত তুলে, সেখানে উপস্থিত সব ভক্তদের চারটে ডিমের আকারের গাঁট দেখিয়ে বলেন- **"দেখ, ভক্তদের জন্য আমি সব রকমেরই কষ্ট সহ্য করি। ওদের কষ্ট আমার কষ্ট।"** এই অদ্ভুত ও অসাধারণ লীলা দেখে ভক্তদের কোন সন্দেহ রইল না যে, সন্তরা ভক্তদের কল্যাণার্থে কতরকম কষ্ট নিজেদের উপর নিয়ে নেন। তাঁদের হৃদয় মোমের চেয়েও নরম এবং মাখনের মত কোমল হয়। তাঁরা ভক্তদের নিঃস্বার্থ প্রেম করেন ও তাদের নিজের পরম আত্মীয় মনে করেন।

পন্ঢরপুর যাত্রা ও সেখানে থাকা ঃ-

বাবা নিজের ভক্তদের কত ভালবাসতেন এবং কিভাবে তাদের মনের সমস্ত ইচ্ছে ও কথাগুলি আগেই জেনে যেতেন, সেইটা বর্ণনা করে এই অধ্যায়টি শেষ করব।

নানাসাহেব চাঁদোরকর বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। উনি খানদেশে নন্দুরবারেতে মাম্‌লৎদর ছিলেন। কিছুদিন পর ওঁর পন্ঢরপুরে স্থানান্তরণ হয়। বাবার ভক্তির ফলস্বরূপ, উনি পন্ঢরপুরে (যাকে ভূবৈকুন্ঠ মানা হয়) থাকার সুযোগ পান। নতুন জায়গায় কাজ সামলাবার আগে, উনি তাঁর পন্ঢরপুরে (শিরডী) নিজের বিঠোবাকে (শ্রী বাবা) প্রণাম করে পন্ঢরপুরের জন্য রওনা হতে চাইছিলেন। সময়াভাবে কোন চিঠি বা খবর না দিয়েই, খুব তাড়াতাড়ি শিরডীর জন্য বেরিয়ে পড়েন। সুতরাং নানা সাহেবের আসার ব্যাপারে কেউ কিছু জানত না। কিন্তু বাবা তো অন্তর্যামী। তাঁর কাছে কিই বা লুকানো থাকে? তিনি তো সর্বজ্ঞ। যে সময় নানা সাহেব নিমগ্রামে (শিরডী থেকে ২-৩ মাইল দূর) পৌঁছন সেই সময় বাবা মহালসাপতি, আপ্পা শিন্দে এবং কাশীরামের সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ মস্‌জিদে একটা স্তব্ধতা ছেয়ে গেল এবং বাবা বলে উঠলেন- " চলো চারজনে মিলে ভজন গাই - পন্ঢরপুরের দ্বার খোলা আছে - চলো সবাই মিলে প্রেমপূর্বক গাই (পন্ঢরপুরলা জায়াঞ্চে জায়াঞ্চে, তিথেঞ্চ মজলা, রাহাঞ্চি তিথেঞ্চে মজলা রাহাঞ্চে ঘরতে মাঝ্‌য়া রায়াঞ্চে)।" ভজনের ভাবার্থ - আমায় পণ্ঢরপুরে গিয়ে থাকতে হবে। কারণ ঐটি আমার স্বামী অর্থাৎ ঈশ্বরের ঘর। বাবার সাথে-সাথে সব ভক্তরা এই ভজনটি গাইতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর, নানাসাহেব সপরিবারে সেখানে পৌঁছে

বাবাকে প্রণাম করেন। তিনি বাবাকে পণ্ঢরপুরে স্থানান্তরণের খবর দিয়ে তাঁর সাথে পণ্ঢরপুর যেতে অনুরোধ করেন। ভক্তরা নানাসাহেবকে জানান যে, বাবা স্বয়ং ওনার আসার আগে থেকেই পণ্ঢরপুরে থাকার আনন্দে বিভোর এবং তাঁর এই প্রার্থনার আবশ্যকতা বাবা নিজেই দূর করে দিয়েছেন। এই কথা শুনে নানাসাহেব বাবার চরণে লুটিয়ে পড়েন এবং বাবার আশীর্বাদ ও উদী নিয়ে পণ্ঢরপুর অভিমুখে প্রস্থান করেন। বাবার লীলা অনন্ত। অন্যান্য বিষয় - যেমন মানব জন্মের মাহাত্ম্য, বাবার ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ, বায়জাবাইয়ের সেবা এবং অন্য ঘটনাগুলি পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য রেখে আমাদের এখানে বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৮

মানব জন্মের গুরুত্ব, শ্রী সাইবাবার ভিক্ষাবৃত্তি, বায়জাবাঈয়ের সেবা, শ্রী সাইবাবার শয়নকক্ষ, খুশালচন্দের প্রতি প্রেম।

গত অধ্যায়ের ইঙ্গিত মত এবার হেমাডপন্ত মানব জন্মের মাহাত্ম্য বিস্তৃত রূপে বোঝাবেন। শ্রী সাইবাবা কিভাবে ভিক্ষা অর্জন করতেন, বায়জাবাঈ বাবার কিরূপ সেবা করতেন, তিনি মস্‌জিদে তাত্‌য়া কোতে ও ম্‌হালসাপতির সাথে কিভাবে শুতেন এবং খুশালচন্দকে তিনি কতখানি স্নেহ করতেন, তারই বিবরণ এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

মানব জন্মের মাহাত্ম্য ঃ-

এই বিচিত্র সংসারে ঈশ্বর লক্ষ - লক্ষ প্রাণী (হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ৮৪ লক্ষ) সৃষ্টি করেছেন (যেমন-দেব, দানব, গর্ন্ধব্য, জীব-জন্তু ও মানুষ ইত্যাদি) যারা স্বর্গ, নরক, পৃথিবী, সমুদ্র ও আকাশে বাস করে এবং ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম পালন করে। এই প্রাণীদের মধ্যে, যাদের পুণ্য প্রবল তারা স্বর্গে বাস করে এবং নিজেদের সৎ কর্মের ফল ভোগ করে। যখন তাদের পাপ-পুণ্য সমান সমান হয়ে যায় তখন তারা মানব জন্মের ও মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পায়। পাপ ও পুণ্য দুটিই নষ্ট হয়ে গেলে, তারা মুক্ত হয়ে যায়। নিজের কর্ম বা প্রারব্ধ অনুসারে, আত্মা জন্ম নেয় বা দেহ ধারণ করে।

মনুষ্য শরীর অমূল্য ঃ-

এ কথাতো ঠিক যে চারটে জিনিষ সব প্রাণীরই রয়েছে - আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। কিন্তু সব প্রাণীদের মধ্যে, মানবের 'জ্ঞান'

একটি বিশেষ ক্ষমতা, যার সাহায্যে সে ঈশ্বর দর্শন করতে পারে। এইটি অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দেবতারাও মানব জন্মকে ঈর্ষা করেন এবং পৃথিবীতে মানব দেহ ধারণ করার জন্য সর্বদাই লালায়িত থাকেন, যাতে শেষে মুক্তি পেতে পারেন।

অবশ্য অনেকেরই এই ধারণা যে, মানব দেহ অনেক গ্লানিময়। কৃমি, মলাদি এবং শ্লেষ্মা দিয়ে ভরা, রোগগ্রস্ত, নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। নিঃসন্দেহে এই তথ্যটি অংশতঃ সত্য। কিন্তু এত দোষপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানব শরীরের মূল্য অনেক বেশী, কারণ জ্ঞান-প্রাপ্তি এই দেহতেই সম্ভব। মানব শরীর পাওয়ার পরই তো জানা যায় যে, এই শরীর নশ্বর এবং বিশ্ব পরিবর্তনশীল। এইরূপ ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিকে তিলাঞ্জলি দিয়ে, সৎ-অসতের বিবেকজ্ঞান জাগলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করা যেতে পারে। সুতরাং শরীরকে তুচ্ছ ও অপবিত্র মনে করে তার উপেক্ষা করলে, ঈশ্বর-দর্শনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। আবার শরীরকে অতি মূল্যবান মনে করে, তার মোহে পড়ে থাকলে, আমরা ইন্দ্রিয়-সুখের দিকে প্রবৃত্ত হয়ে যাব এবং তখন আমাদের পতন সুনিশ্চিত।

সুতরাং সঠিক পথ হবে এটাই যে, শরীরকে উপেক্ষা করা অথবা তার প্রতি আসক্ত হওয়া, কোনোটাই উচিত নয়। ঠিক একটা ঘোড়সওয়ারের মত, ঘোড়াকে ততক্ষন দেখাশোনা করা উচিত যতক্ষন সে যাত্রা শেষ করে নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরে না আসে।

তাই ঈশ্বর-দর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের জন্য নিজের শরীরকে লাগিয়ে রাখা উচিত। এইটাই আমাদের জীবনের আসল লক্ষ্য। শাস্ত্রে বলে যে, অনেক প্রাণী উৎপন্ন করার পরও, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না;

কারণ কোন প্রাণীই, তাঁর অলৌকিক রচনা বুঝতে বা অনুভব করতে সমর্থ ছিল না। তাই তিনি একটি বিশেষ প্রাণী, অর্থাৎ মানবজাতির সৃষ্টি করেন। মানুষের মধ্যে তাঁর লীলা, অদ্ভুত সৃষ্টি ও জ্ঞান বোঝবার যোগ্যতা দেখে তাঁর খুবই আনন্দ ও সন্তুষ্টি হয় (ভাগবৎ স্কন্ধ ১১--২৮ অনুসারে)। তাই মানব জন্ম বড়ই সৌভাগ্যসূচক, উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া তো আরও এক সৌভাগ্য। কিন্তু শ্রী সাই চরণাম্বুজে প্রীতি ও তাঁর শরণাগতি প্রাপ্ত হওয়া, এটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

মানুষের প্রচেষ্টা ঃ-

এই সংসারে মানব-জন্ম অতি দুর্লভ। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তো নিশ্চিত এবং যে কোন সময়ই মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন করতে পারে। এই ধারণাটিই দৃঢ় করে, আমাদের নিজেদের লক্ষ্য প্রাপ্তির প্রতি সব সময় তৎপর থাকা উচিত। যেরকম হারানো রাজকুমারের খোঁজে রাজা সব রকম উপায় অবলম্বন করেন, ঠিক তেমনি কিঞ্চিৎমাত্র দেরী না করে, নিজের অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য শীঘ্রতা দেখানোই উচিত। সুতরাং সম্পূর্ণ উৎসাহের সাথে, আলস্য ও নিদ্রা ত্যাগ করে, আমাদের সর্বক্ষণ ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। এই রকম না করতে পারলে, নিজেদের পশু তুল্যই মনে করতে হবে।

কিভাবে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ঃ-

সুলভে ভাগবৎ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করার একমাত্র উপায় হলো- কোন যোগ্য সন্ত বা সদ্‌গুরুর (যাঁর ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়ে গেছে) চরণে আশ্রয় নেওয়া। যে লাভ, ধার্মিক উপদেশ শ্রবণ করে বা ধার্মিক গ্রন্থ পড়ে পাওয়া যায় না, সেটা সহজেই এই ধরণের অসাধারণ আত্মজ্ঞানীদের সংসর্গে পাওয়া যায়। যে আলো আমরা সূর্য্য থেকে

পাই, তা বিশ্বের সমস্ত তারাগুলি একত্রিত হয়ে গেলেও, পাওয়া যাবে না। ঠিক সেই রকমই যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপলব্ধি আমরা সদ্‌গুরুর কৃপায় করতে পারি, সেটা গ্রন্থ বা উপদেশ দ্বারা সম্ভব নয়। তাঁদের প্রত্যেকটি গতিবিধি, মৃদু ভাষণ, গুহ্য উপদেশ, ক্ষমাশীলতা, স্থিরতা, বৈরাগ্য, দান এবং পরোপকারীতা, শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ, অহংকার শূণ্যতা ইত্যাদি গুণ গুলি যে রূপ আচরণে প্রদর্শিত হয়, ভক্তরা সৎসঙ্গ দ্বারা, সেগুলি প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। এই ভাবে মনশ্চক্ষু জাগ্রত হয় এবং দিনে -দিনে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। শ্রী সাইবাবা এই ধরনেরই সন্ত বা সদ্‌গুরু ছিলেন। যদিও তিনি বাহ্যত এক ফকিরের মত অভিনয় করতেন, কিন্তু সর্বদা আত্মলীন হয়ে থাকতেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীকে ভালবাসতেন এবং তাদের মধ্যে ভগবদ্দর্শন করতেন। ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। বিপদের সম্মুখীন হয়ে তিনি কখনো বিচলিত হতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে গরীব ও বড়লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যাঁর শুধুমাত্র কৃপাদৃষ্টি দ্বারা ভিখিরী রাজা হয়ে যেত, তিনি শিরডীর দ্বারে-দ্বারে ঘুরে ভিক্ষে চাইতেন। এই কাজটি তিনি এভাবে করতেন।

বাবার ভিক্ষাবৃত্তি ঃ-

সেই শিরডী বাসীদের সৌভাগ্য কে কল্পনা করতে পারে, যাদের দ্বারে পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভিক্ষুক রূপে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেন - "মাগো, একটা রুটির টুকরো পেতে পারি?" এবং সেটা গ্রহণ করার জন্য হাত পাততেন। এক হাতে একটি বড় গেলাস ও অন্য হাতে একটি ঝোলা থাকত। কয়েকটি বাড়ীতে তো তিনি প্রতিদিনই যেতেন এবং কয়েকটি বাড়ীর সামনে দিয়ে শুধু ঘুরে আসতেন। তিনি তরল পদার্থ যেমন দুধ, ঘোল ইত্যাদি গেলাসে নিতেন ও ভাত বা রুটি ইত্যাদি

অন্য শুকনো বস্তু ঝোলাতে ঢেলে নিতেন। বাবার জিভে কোন স্বাদ ছিল না, কারণ তিনি সেটা নিজের বশে করে নিয়েছিলেন। তাই বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর চিন্তা তাঁর ছিল না। যা যা ভিক্ষেতে পেতেন, সেগুলি সব মিশিয়ে নিয়ে তৃপ্তি সহকারে গ্রহণ করতেন।

অমুক বস্তুটি সুস্বাদু কিনা, সেকথা বাবা কখনো ভাবেন নি, কারণ তাঁর জিভে স্বাদের বোধই ছিল না। তিনি শুধু দুপুর পর্যন্ত ভিক্ষা করতেন, যদিও এরও কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। কোনদিন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে আসতেন, আবার কোন-কোনদিন প্রায় বারোটা বেজে যেত। একত্রিত খাদ্য বস্তুগুলি একটা পাত্রে ঢেলে দিতেন। সেখানে কুকুর, বেড়াল, কাক ইত্যাদি সব রকমের প্রাণী আনন্দ সহকারে খেতো। বাবা ওদের কখনো তাড়াতেন না। যে মেয়েটি মস্‌জিদে ঝাড়ু দিতো, সে রোজ রুটির দশ-বারোটা টুকরো নিয়ে যেত, কিন্তু কেউ কখনো ওকে মানা করত না। যিনি স্বপ্নেও কুকুর - বেড়ালকে কখনো 'দূর-ছাই' করেননি, তিনি সে নিঃসহায় গরীবদের কি করে রুটি দিতে আপত্তি করতে পারতেন? এমন মহান পুরুষের জীবন ধন্য। শিরডীবাসীরা তো প্রথম-প্রথম তাঁকে পাগলই মনে করত এবং তিনি এই নামে শিরডীতে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন। যিনি ভিক্ষের ক'টি টুকরো দ্বারা জীবন নির্বাহ করতেন, তাঁর সম্মান থাকেই বা কি করে? কিন্তু তিনি ত্যাগী, ধর্মাত্মা ও উদার হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। যদিও তাঁকে দেখে চঞ্চল ও অশান্ত মনে হত, কিন্তু অন্তঃকরণে তিনি দৃঢ় ও স্থিরস্বভাব ছিলেন। তাঁর পথ গহন ও গূঢ় ছিল। তবুও গ্রামের কিছু সৌভাগ্যশালী ও শ্রদ্ধাবান লোকেরা তাঁকে সঠিক চিনেছিল এবং এক মহান পুরুষ মেনে তাঁকে শ্রদ্ধা করত। এরই উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে -

বায়জাবাইয়ের সেবা ঃ-

তাত্য়া কোতের মা, যাঁর নাম বায়জাবাই ছিল, দুপুরের সময় একটা টুকরীর মধ্যে রুটি ও সব্জি রেখে জঙ্গলে গিয়ে বাবাকে খাওয়াবার জন্য খুঁজে বেড়াতেন। অনেক সময় অনেক দূর পর্যন্ত চলে যেতেন ও বাবাকে দেখতে পেয়ে তাঁর চরণ দুটি ধরে নিতেন। বাবা তো ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকতেন। বায়জাবাই একটা শাল পাতা বিছিয়ে তার উপর রুটি, সব্জি ইত্যাদি সাজিয়ে, বাবাকে খেতে পীড়াপীড়ি করতেন। ওঁর সেবা ও শ্রদ্ধার রীতি অতি বিচিত্র ছিল। প্রতিদিন বাবাকে জঙ্গলে খোঁজা ও খেতে অনুরোধ করা। ওঁর এই সেবা ও উপাসনার কথা, বাবার শেষ সময় পর্যন্ত মনে ছিল। এই সেবার কথা মনে করে, বাবা ওঁকে অনেক রকমের অনুগ্রহ করেছিলেন। মা ও পুত্র দুজনেরই বাবার উপর দৃঢ় নিষ্ঠা ছিল। ওঁরা বাবাকে সর্বদা ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করতেন। বাবা কখনো-কখনো ওঁদের বলতেন- "ফকিরের জীবনই সত্যিকারের ঐশ্বর্য্য। এটি অন্তহীন। যাকে আমরা ঐশ্বর্য্য বলে মনে করি, সেটা খুব শীঘ্রই লুপ্ত হয়ে যায়।" কিছু বছর পর, বাবা জঙ্গলে ঘোরা বন্ধ করে দেন। তিনি গ্রামে থাকতে ও মস্জিদেই খাবার খেতে শুরু করেন। তাই বায়জাবাইও বাবাকে খুঁজতে বেরোবার কষ্ট থেকে মুক্তি পান।

তিনজনের শোওয়ার ঘর ঃ-

সেই সাধু পুরুষেরা ধন্য, যাদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব সর্বদা বাস করেন। সেই ভক্তরাও ভাগ্যবান, যারা তাঁদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত করতে পারে। এমনি দুজন ভাগ্যবান ভক্ত ছিলেন - **১)** তাত্য়া কোতে পাটীল **২)** ভগত মহালসাপতি। দুজনেই বাবার সান্নিধ্যে কৃপাধন্য

হন। বাবা দুজনকেই সমানরূপে ভালবাসতেন। এই তিন মহানুভব নিজেদের মাথা পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে করে এবং মাঝখানে একে-অপরের পায়ের সাথে পা জুড়ে, মস্জিদে শুতেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অর্দ্ধেক রাত্রি পর্যন্ত মনের আনন্দে খোশগলপ ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। যদি একজন ঘুমিয়ে পড়তেন, তো অন্যজন তাকে জাগিয়ে দিতেন। তাত্য়া নাক ডাকা শুরু করলেই, বাবা উঠে ওঁকে ঝাঁকিয়ে ও জোরে মাথা টিপে দিতেন। আর ম্হালসাপতি ঘুমিয়ে পড়লে, বাবা ওঁকেও নিজের দিকে টেনে, পায়ে ধাক্কা দিয়ে পিঠ থাপড়াতেন। এইভাবে তাত্য়া নিজের বাবা-মাকে বাড়ীতে ছেড়ে, বাবার প্রেম ও প্রীতির আবেশে তাঁর সাথে মস্জিদে **১৪** বছর থাকেন। কত সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি! সেগুলি কি কখনো ভোলা যেতে পারে? সেই ভালবাসার কিই বা উপমা দেওয়া যেতে পারে? বাবার কৃপার মূল্য কিভাবে নিরূপণ করা যেতে পারে? পিতার মৃত্যুর পর, তাত্য়ার উপর ঘর-সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে, তাই তিনি নিজের বাড়ীতেই শুতে শুরু করেন।

রাহাতা নিবাসী খুশালচন্দ ঃ-

শিরডী নিবাসী, গণপত তাত্য়া কোতেকে বাবা খুব ভালবাসতেন। তিনি রাহাতার মারোয়াড়ী শেঠ শ্রী চন্দ্রভানকেও খুব ভালবাসতেন। ওঁর মৃত্যুর পর, বাবা ওঁর ভাইপো খুশালচন্দকেও খুব স্নেহ করতে শুরু করেন। বাবা সর্বদা ওঁর কল্যাণ চিন্তা করতেন। কখনো গরুরগাড়ীতে, কখনো ঘোড়াগাড়ীতে তিনি নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সাথে রাহাতা যেতেন। বাবা যেই গ্রামের ফাটকে পা দিতেন, গ্রামবাসীরা সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে অপূর্ব অভ্যর্থনা জানাত। তাঁকে প্রণাম করে খুব ঘটা করে গ্রামের ভেতরে নিয়ে যেতো। খুশালচন্দ বাবাকে

নিজের বাড়ী নিয়ে যেতেন। নরম আসনে বসিয়ে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করতেন। তারপর খানিকক্ষণ খুশিতে খোলা মনে গল্প-গুজব করতেন। শেষে বাবা সবাইকে আনন্দিত করে ও আশীর্বাদ দিয়ে শিরডী ফিরে আসতেন। শিরডীর দক্ষিণে রাহাতা ও উত্তরে নিমগ্রাম। মাঝখানে শিরডী। বাবা জীবদ্দশায় এই দুটির সীমা পার করে কখনো যাননি। তিনি কখনো রেলগাড়ী দেখেননি বা চড়েননি। তবুও তিনি প্রত্যেকটি গাড়ীর সময় ঠিক-ঠিক জানতেন। যারা বাবার কাছে ফেরার অনুমতি নিয়ে তাঁর আদেশানুসারে রওনা হত, তারা সকুশল বাড়ী পৌঁছে যেত। অপর দিকে, যারা বাবার আদেশ অবজ্ঞা করত, তাদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনার সম্মুখীণ হতে হতো। এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক ঘটনা ও অন্যান্য বিষয় বর্ণনা, পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে করা হবে।

এই অধ্যায়ের শেষে; বাবার খুশালচন্দের প্রতি প্রেমের সম্বন্ধে টীকা দেওয়া হয়েছে। তিনি কিভাবে কাকা সাহেব দীক্ষিতকে রাহাতা গিয়ে খুশালচন্দকে শিরডী নিয়ে আসতে বলেন এবং সেইদিনই দূপুরে খুশালচন্দকে স্বপ্নে শিরডী আসতে বলেন- এ ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে না, কারণ এর বর্ণনা এই সৎচরিত্রের ৩০ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ৯

রওনা হওয়ার সময় বাবার আজ্ঞা পালন এবং অবজ্ঞা করার পরিণামের কয়েকটি উদাহরণ, ভিক্ষাবৃত্তি ও তার আবশ্যকতা, ভক্তদের (তর্খড পরিবারের) অভিজ্ঞতা।

গত অধ্যায়ের শেষদিকে বলা হয়েছিল যে, ফেরবার সময় যাঁরা বাবার আদেশ পালন করতেন, তাঁরা নির্বিঘ্নে বাড়ী পৌঁছোতেন এবং যাঁরা অমান্য করতেন তাঁদের অনেক হেনস্থা ভুগতে হত। এই অধ্যায়ে এই কথাটি কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে বোঝান হবে।

শিরডী যাত্রার বিশেষত্ব ঃ-

শিরডী যাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল যে, বাবার অনুমতি ছাড়া কেউ শিরডী থেকে প্রস্থান করতে পারত না এবং যদি কেউ দুভার্গ্যবশতঃ বাবার আজ্ঞা অবজ্ঞা করে যাত্রা করত, তাহলে সে অনেক অসুবিধেয় পড়ত। আবার এও ঠিক যে, যদি কাউকে বাবা শিরডী থেকে রওনা হওয়ার আদেশ দিয়ে দিতেন তাহলে, তার আর সেখানে বেশীক্ষণ থাকবার সুযোগ হত না। যখন ভক্তরা রওনা হওয়ার সময় বাবাকে প্রণাম করতে যেত, তখন বাবা ওদের যা আদেশ দিতেন, সেটাই পালন করতে হোত। এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

তাত্য়া কোতে পাটীল ঃ-

একবার তাত্য়া কোতে টাঙ্গায় করে কোপর গ্রামের বাজারে যাচ্ছিলেন। ওঁর একটু তাড়া ছিল। তাই তাড়াহুড়ো করে মস্‌জিদে

আসেন। বাবাকে প্রণাম করে বলেন- "আমি কোপরগ্রামের বাজারে যাচ্ছি।" বাবা বললেন- "অত তাড়াহুড়ো কোরো না। বাজার যাওয়ার ইচ্ছে ছাড়ো, গ্রামের বাইরে যেও না।" কিন্তু ওঁর তীব্র ইচ্ছে দেখে বাবা বলেন- "আচ্ছা, এক কাজ করো, শামাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।" বাবার আদেশ না মেনে, তাত্য়া তক্ষুনি টাঙ্গায় চড়ে বেরিয়ে পড়েন। টাঙ্গার দুটি ঘোড়ার মধ্যে একটা (যার দাম প্রায় তিনশো টাকা ছিল) খুবই চঞ্চল ও দ্রুতগামী ছিল। সাঁওলী বিহীর গ্রাম পার করতেই, ঘোড়াটি প্রচণ্ড বেগে দৌড়তে লাগল। অকস্মাৎ কোমরে মোচড় লাগতে, সে ওখানেই পড়ে যায়। যদিও তাত্য়ার বেশী ব্যথা লাগেনি, কিন্তু নিজের সাই মায়ের আদেশের কথা অবশ্যই মনে পড়ে যায়। আরেকবার কোল্‌হার গ্রামে যাওয়ার সময় উনি বাবার আদেশ অবজ্ঞা করেন এবং আগের ঘটনার মতই ওনাকে দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হয়।

এক ইউরোপীয় মহাশয় ঃ-

একবার বম্বের এক ইউরোপীয় মহাশয়, নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছ থেকে পরিচয়-পত্র নিয়ে কোন বিশেষ কাজে শিরডী আসেন। ওঁকে একটা বড় তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হয়। উনি বাবার সামনে নত হয়ে তাঁর হাতে চুমু খেতে চাইছিলেন। তাই তিনবার মস্‌জিদে সিঁড়ি চড়তে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাবা ওকে নিজের কাছে আসতে দেন না। ওঁকে সভা-মণ্ডপেই বসতে এবং ওখানে থেকেই দর্শন করতে বলা হয়। এই বিচিত্র অভ্যর্থনায় অপ্রসন্ন হয়ে, ভদ্রলোক শীঘ্রই শিরডী থেকে চলে যাবেন বলে স্থির করেন এবং রওনা হওয়ার অনুমতি নেওয়ার জন্য মস্‌জিদে আসেন। বাবা ওঁকে পরের দিন রওনা হতে ও উৎকণ্ঠা না করতে পরামর্শ দেন। অন্য উপস্থিত ভক্তরাও ওঁকে বাবার আদেশ পালন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু

উনি কারো কথায় কান না দিয়ে, টাঙ্গায় চড়ে রওনা হয়ে যান। কিছুদূর পর্য্যন্ত ঘোড়াগুলি ভালভাবেই চলল। কিন্তু সাঁওলী বিহীর গ্রাম পার হতেই, একটা সাইকেল সামনে থেকে আসতে দেখে, ঘোড়াগুলি ভয় পেয়ে জোর ছুট লাগাল। ফলে টাঙ্গা উল্টে যেতেই, ভদ্রলোক নীচে পড়ে যান এবং কিছু দূর টাঙ্গার সাথেই রাস্তায় রগড়ানি খান। লোকেরা তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে ওঁকে বাঁচিয়ে নেয়। ওঁকে কোপরগ্রামে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। এই ঘটনাটির থেকে ভক্তরা শিক্ষা গ্রহণ করেন যে, বাবার আদেশ অবহেলা করলে, কোন-না-কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতেই হয়। যারা বাবার আজ্ঞা পালন করে, তারা নির্বিঘ্নে ও আনন্দে গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

ভিক্ষাবৃত্তির আবশ্যকতা ঃ-

এবার আমরা ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্নের উপর বিচার করব। অনেকের মনে এই সন্দেহ জাগতে পারে যে, বাবা এত মহান পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও আজীবন ভিক্ষাবৃত্তি করে কেন জীবন নির্বাহ করেন? এই প্রশ্নের উত্তর দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম দৃষ্টিকোণ - ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করার অধিকারী কে?

শাস্ত্রানুসারে, যাঁরা তিনটি তীব্র আসক্তি যথা - কামিনী, কাঞ্চন ও কীর্তি ত্যাগ করেছেন, আসক্তি মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন তাঁরাই ভিক্ষাবৃত্তির উপযুক্ত অধিকারী। কারণ তাঁরা নিজের বাড়ীতে খাবার তৈরী করার ব্যবস্থা করতে পারেন না। অতএব তাঁদের ভোজনের ভার গৃহস্থদের উপর দেওয়া হয়েছে। শ্রী সাইবাবা না তো গৃহস্থ ছিলেন আর না বানপ্রস্থী। বাল্যকাল থেকে তিনি ব্রহ্মচারী

সন্ন্যাসী। তাঁর এইটাই দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সম্পূর্ণ বিশ্ব তাঁর বাসস্থান। তিনি স্বয়ং বিশ্ব পালনকর্তা ভগবান শ্রী বাসুদেব ও পরমব্রহ্ম। অতএব তিনি ভিক্ষা অর্জন করার পূর্ণ অধিকারী!

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ -

পাঁচটি পাপ ও তাদের প্রায়শ্চিত্ত ঃ- সবাই জানে যে, খাবার বানানোর বা রান্নার জন্য গৃহস্থকে পাঁচ রকমের কাজ করতে হয় - **১)** পেষা **২)** চূর্ণ করা **৩)** বাসন মাজা **৪)** ঘর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা **৫)** উনুন জ্বালানো। এই কাজগুলির পরিণামস্বরূপ, অনেক পোকা-মাকড় ও জীব মরে যায় এবং তাতে গৃহস্থকে পাপের ভাগী হতে হয়। এই পাপগুলির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, শাস্ত্রতে পাঁচ রকমের যজ্ঞ করার বিধান দেওয়া হয়েছে, যেমন - **১)** ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন -ব্রহ্মকে অর্পণ করা বা বেদ অধ্যয়ন করা **২)** পিতৃযজ্ঞ - পূর্বপুরুষদের দান **৩)** দেবযজ্ঞ - দেবতাদের নামে উৎসর্গ **৪)** ভূতযজ্ঞ - প্রাণীদের দান **৫)** মনুষ্যযজ্ঞ - মানুষদের (অতিথিদের) দান।

যদি এই কর্মগুলি শাস্ত্রানুসারে বিধিপূর্বক করা হয়, তাহলে মন শুদ্ধ হয়ে জ্ঞান ও আত্মানুভূতির প্রাপ্তি সুলভ হয়ে যায়। বাবা দ্বারে-দ্বারে গিয়ে, গৃহস্থদের এই পবিত্র কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতেন। তারা খুবই ভাগ্যবান, যারা বাড়ী বসে, বাবার দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিল।

ভক্তদের অভিজ্ঞতা ঃ-

এবার একটি মনোরঞ্জক বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলেছেন - **"যে আমায় ভক্তিপূর্বক কেবল একটা**

পাতা, ফুল, ফল বা জল অর্পণ করে, আমি সেই শুদ্ধচিত্তের ভক্তের দ্বারা অর্পিত বস্তু সানন্দে স্বীকার করি।"

যদি ভক্তদের শ্রী সাইবাবাকে সত্যি-সত্যি কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছে হত এবং অর্পণ করার কথা তারা যদি ভুলে যেত তাহলে বাবা তাদের কিংবা তাদের বন্ধুদের ঐ উপহারের কথা মনে করিয়ে দিতেন এবং সেটা দিতে বলতেন। বলাবাহুল্য, উপহার পাওয়ার পর তাদের আশিসও দিতেন। এই ধরনের কিছু ঘটনা নীচে বর্ণনা করা হচ্ছে।

তর্খড পরিবার (পিতা ও পুত্র) ঃ-

শ্রীরামচন্দ্র আত্মারাম উপনাম বাবাসাহেব তর্খড প্রথমে প্রার্থনা সমাজী ছিলেন। তবুও তিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। একবার উনি স্থির করেন যে, ছেলে ও মা গরমকালের ছুটি শিরডীতেই কাটাবে। কিন্তু ছেলের বান্দ্রা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। ওর ভয় ছিল যে, শ্রীবাবার পূজো নিয়ম মত হতে পারবে না। পিতা প্রার্থনা সমাজের রীতি অনুসরণ করেন, তাই খুব সম্ভব শ্রী সাইবাবার পূজা ইত্যাদির খেয়াল রাখতে পারবেন না। কিন্তু পিতা আশ্বাস দেন যে, বাবার পূজোয় কোন বাধা পড়বে না এবং মা ও ছেলে শুক্রবার রাতে শিরডী অভিমুখে রওনা হন। পরের দিন শনিবার। শ্রীমান তর্খড ব্রহ্মমুহূর্তে উঠে, স্নানাদি সেরে, পূজো শুরু করার আগে, বাবাকে প্রণাম করে প্রার্থনা করেন- "হে বাবা। আমি ঐ ভাবেই আপনার পূজো-অর্চনা করব, যেমনটি আমার ছেলে করত। কিন্তু কৃপা করে এটা একটা আনুষ্ঠানিক কর্মের সীমায় আবদ্ধ রাখবেন না।" এই বলে

উনি পূজো আরম্ভ করেন এবং মিছরি নৈবেদ্য অর্পণ করেন, যেটা দুপুরের খাবারের সাথে প্রসাদ রূপে বিতরণ করা হয়। সেই সন্ধ্যা ও পরের দিন (রবিবার) নির্বিঘ্নে কেটে যায়। সোমবার দিন উনি অফিস যান, কিন্তু সেদিনটাও নির্বিঘ্নে কেটে যায়। শ্রী তর্খড জীবনে কখনো এইভাবে পূজো করেননি। ওঁর এই ভেবে খুব ভাল লাগছিল যে, ছেলেকে দেওয়া কথামত পূজো যথারীতি সন্তোষজনক ভাবে চলছে। পরের দিন (মঙ্গলবার) রোজকার মত পূজো করে, উনি অফিস চলে যান। দুপুরে বাড়ী ফিরে খেতে বসে, থালায় প্রসাদ না দেখতে পেয়ে, রাঁধুনিকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে ওঁকে জানায় যে, আজ ভুলবশতঃ উনি নৈবেদ্য অর্পণ করেননি। এই কথা শুনে উনি তক্ষুনি আসন থেকে উঠে বাবাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। সঠিক পথ প্রদর্শন না করার জন্য ও পূজোটিকে কেবল শারীরিক পরিশ্রম পর্যন্ত সীমিত রাখার জন্য বাবার উপর দোষারোপ করেন। সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে, উনি একটা চিঠি ছেলেকেও লেখেন এবং ওকে বলেন- "এই চিঠিটা বাবার শ্রীচরণে রেখে তাঁকে বোলো যে, এই অপরাধের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।" এই ঘটনাটি দুপুর বেলায় বান্দ্রাতে ঘটেছিল। ঠিক ঐ সময়ই শিরডীতে মধ্যাহ্ন আরতি শুরু হবে, এমন সময় বাবা শ্রীমতি তর্খডকে বলেন- "মা, আমি কিছু খাবার পাওয়ার আশায় তোমার বাড়ী (বান্দ্রাতে) গিয়েছিলাম। দরজায় তালা দেখেও, কোনরকমে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করি। কিন্তু সেখানে দেখি মহাশয় (শ্রী তর্খড) আমার জন্য কিছুই (খাবার) রেখে যাননি। তাই আমি ক্ষুধার্তই ফিরে এসেছি।" শ্রীমতি তর্খড বাবার কথার মানে বুঝতে পারলেন না। কিন্তু শ্রী তর্খডের ছেলে, সমস্ত ব্যাপারটি বুঝে গেল যে, নিশ্চয় বান্দ্রাতে বাবার পূজোয় কোন ভুল হয়ে গেছে। তাই ও বাবার কাছে অবিলম্বে

বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল। কিন্তু বাবা ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না এবং শিরডীতে থেকে সেখানেই পূজো করার আদেশ দেন। শিরডীতে যা-যা ঘটল, তা একটা চিঠিতে লিখে ছেলে নিজের বাবাকে পাঠায় ও ভবিষ্যতে পূজোয় সাবধান থাকতে অনুরোধ করে। দুটো চিঠিই ডাক মারফত দুই পক্ষ একই সময় পায়। ঘটনাটি অত্যাশ্চর্য্য নয় কি?

শ্রীমতি তর্খড ঃ-

একবার শ্রীমতি তর্খড তিনটি জিনিষ-মশলা মাখানো বেগুন ভাজা, বেগুনের গোল টুকরো ঘিয়ে ভাজা ও পেঁড়া বাবার জন্য পাঠান। বাবা সেগুলিকে কিভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করেন, এবার আমরা সেটাই দেখব।

বান্দ্রার শ্রী রঘুবীর ভাস্কর পুরন্দরে বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীমতি তর্খড শ্রীমতি পুরন্দরেকে দুটো বেগুন দেন এবং শিরডী পৌঁছে উপরোক্ত দুটি ব্যঞ্জন বাবাকে অর্পণ করতে অনুরোধ করেন। শিরডী পৌঁছে শ্রীমতি পুরন্দরে প্রথম ব্যঞ্জনটি (ভূর্তা) নিয়ে মস্‌জিদে যান। বাবা ঠিক সেই সময়েই খেতে বসেছিলেন। বাবার বেগুনের 'ভূর্তা' খেয়ে খুবই ভাল লাগে এবং একটু-একটু সবাইকে বিতরণ করেন। কিছুক্ষণ পরই বেগুনের 'কাচরা' (দ্বিতীয় ব্যঞ্জনটি) আনতে বলেন। রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের কাছে খবর পাঠানো হয় যে, বাবা বেগুন ভাজা চেয়ে পাঠিয়েছেন। এবার রাধাকৃষ্ণমাঈ তো খুবই বিপদে পড়লেন, কারণ বছরের এই সময় তো বেগুন পাওয়াও যায় না। বেগুন পাওয়াটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এবার খোঁজ পড়ল যে, বেগুনের ব্যঞ্জনটি কে বানিয়ে এনেছিল। তখন জানা গেল যে বেগুন শ্রীমতি

পুরন্দরে এনেছিলেন এবং ওঁকেই বেগুনটি ভেজে বাবাকে পরিবেশন করার ভার দেওয়া হল। এবার সবাই বাবার হঠাৎ বেগুন ভাজা খাওয়ার ইচ্ছার অভিপ্রায় বুঝতে পারল। বাবার সর্বজ্ঞতা দেখে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

ডিসেম্বর **১৯১৫** সালে শ্রী গোবিন্দ বালারাম মানকর শিরডী গিয়ে সেখানে তাঁর বাবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে চাইলেন। রওনা হওয়ার আগে তিনি শ্রীমতি তর্খডের সঙ্গে দেখা করতে যান। শ্রীমতি তর্খড বাবার জন্য কিছু পাঠাতে চাইছিলেন। বাড়ীময় খোঁজাখুঁজির পরও একটা পেঁড়া ছাড়া কিছুই পেলেন না এবং পেঁড়াটাও নৈবেদ্য রূপে আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। নিরুপায় হয়ে সেই পেঁড়াটিই অত্যধিক ভালবাসার বশবর্তী হয়ে, বাবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাবা সেটি অবশ্যই গ্রহণ করবেন। শিরডী পৌঁছে গোবিন্দরাও বাবার দর্শন করতে যান, কিন্তু সেই সময় পেঁড়াটি নিয়ে যেতে ভুলে যান। বাবা কিছু বলেন না। কিন্তু সন্ধ্যার সময়ও যখন গোবিন্দরাও পেঁড়া না নিয়েই বাবার দর্শন করতে যান তখন, বাবা আর চুপ থাকতে না পেরে ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি আমার জন্য কি এনেছ?" উত্তর পান-"কিছু না।" বাবা আবার প্রশ্ন করেন এবং একই উত্তর পান। এবার বাবা স্পষ্ট শব্দে জিজ্ঞাসা করেন- "মা (শ্রীমতি তর্খড) তোমায় রওনা হওয়ার সময় কিছু দেননি?" এবার ওঁর পেঁড়ার কথা মনে পড়ে এবং খুবই লজ্জিত বোধ করেন। বাবার কাছে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চান। তক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে পেঁড়াটি এনে বাবার সামনে রাখেন। বাবা তক্ষুনি সেটি মুখে পুরে ফেলেন। এই ভাবে শ্রীমতি তর্খডের উপহার বাবা গ্রহণ করেন। "ভক্ত আমার উপর বিশ্বাস রাখে তাই আমিও গ্রহণ করে নিই।" - এই ভগবদ্‌বচন

সিদ্ধ হল।

(বাবার) তৃপ্তিকর ভোজন ঃ-

একবার শ্রীমতি তর্খড শিরডী যান। দুপুরের খাবার প্রায় তৈরী এবং থালা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক সেই সময় একটি কুকুর ক্ষিধের চোটে ঘেউ-ঘেউ করতে-করতে সেখানে এসে দাঁড়াল। শ্রীমতি তর্খড তক্ষুণি উঠে গিয়ে রুটির একটা টুকরো কুকুরটাকে দেন। সে গবগব করে সেটা খেয়ে নেয়। বিকেল বেলা যখন বাবা মস্‌জিদে এসে বসেন তখন, তিনি শ্রীমতি তর্খডকে দেখে বলেন- "মা, আজ তুমি আমায় খুব ভালবেসে খাওয়ালে। আমার ক্ষুধার্ত আত্মা বড়ই তৃপ্তি পেল। সব সময় এইরূপ আচরণই কোর, কখনো-না-কখনো তুমি এর উত্তম ফল পাবে। এই মস্‌জিদে বসে আমি কখনো অসত্য ভাষণ করব না। সর্বদা আমার উপর এরকম অনুগ্রহ রেখো - এই কথাটা ভাল ভাবে মনে রেখো।" বাবার কথাগুলি উনি ঠিক বুঝতে পারেন না, তাই প্রশ্ন করেন- "আমি আবার কাকে খেতে দিলাম? আমি তো নিজেই অন্যদের উপর আশ্রিত। অন্যের কাছে অর্থের বিনিময়ে খাবার সংগ্রহ করি।" বাবা তাতে বলেন- "ঐ রুটিটা খেয়ে আমার হৃদয় তৃপ্ত হয়ে গেল এবং এখনো অবধি ঢেকুর উঠছে। **খাবার খাওয়ার আগে, তুমি যে কুকুরটাকে দেখেছিলে এবং যাকে তুমি রুটির টুকরো দিয়েছিলে, সে ত আসলে আমারই স্বরূপ। এই রকম অন্যান্য প্রাণীরাও (বেড়াল, শূকর, মাছি, গরু ইত্যাদি) আমারই স্বরূপ- আমিই ওদের আকারে বিদ্যমান। যে এই সব প্রাণীদের মাঝে আমাকেই দর্শন করে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয়**

ভক্ত। তাই দ্বৈত বা ভেদ ভাব ভুলে, তুমি আমার সেবা কোর।"

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।
(-গীতা ৬/৩০)

এই অমৃততুল্য উপদেশ পেয়ে শ্রীমতি তর্খড হতবাক হয়ে গেলেন এবং ওঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে লাগল, কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এবং মন আনন্দে নেচে উঠল।

শিক্ষা ঃ-

"সমগ্র প্রাণীদের মাঝে ঈশ্বর দর্শন করো" - এইটাই হচ্ছে এই অধ্যায়ের শিক্ষা। উপনিষদ, গীতা ও ভাগবত এই উপদেশ দেয় যে, সব প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বরের বাস, এই সত্যই প্রত্যক্ষ অনুভব কর। অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত ঘটনাটি ও অন্য আরো অনেক দৃষ্টান্ত এখনো লেখা বাকী আছে। বাবা স্বয়ং প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রস্তুত করে দেখাতেন যে, কিভাবে উপনিষদের শিক্ষাগুলি আচরণবদ্ধ করা উচিত এই ভাবে শ্রী সাইবাবা শাস্ত্রগ্রন্থের শিক্ষা দিতেন।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১০

শ্রী সাই বাবার জীবনধারা, শোওয়ার তক্তা, শিরডীতে তাঁর অবস্থান, তাঁর উপদেশ, তাঁর বিনয়, নানাবলী, সহজতম পথ।

প্রারম্ভ ঃ-

শ্রী সাইবাবাকে সর্বক্ষণ প্রেমপূর্বক স্মরণ কর, কারণ তিনি সর্বদা অন্যদের কল্যাণার্থে তৎপর ও আত্মলীন থাকতেন। তাঁকে স্মরণ করলেই, জীবন ও মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। সব সাধনার মধ্যে এটি সব চেয়ে সরল, কারণ এতে কোন অর্থ ব্যয় না। কেবল একটু পরিশ্রমেই ভবিষ্যত ফলদায়ক হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়গুলি সবল থাকাকালীন, প্রতি মুহূর্তে এই সাধনাটির অভ্যাস করা উচিত। অন্যান্য দেবী-দেবতা তো ভ্রম উৎপন্ন করতে পারেন, কেবল গুরুই আমাদের ঈশ্বর। তাঁর পবিত্র চরণে আমাদের শ্রদ্ধা থাকা উচিত। তিনি তো প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যবিধাতা এবং স্নেহময় প্রভু। যে অনন্যরূপে তাঁর সেবা করবে, সে এই ভবসাগর হতে নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে। **দর্শন বা ন্যায়শাস্ত্র পড়ার কোন প্রয়োজন নেই। যেরকম নদী বা সমুদ্র পার করার সময় নাবিকের উপর বিশ্বাস রাখতে হয়, ঠিক সেই রকমই ভবসাগর পার হওয়ার জন্য সদ্‌গুরুর উপর বিশ্বাস রাখা উচিত।** সদ্‌গুরু তো কেবলমাত্র ভক্তদের ভক্তিভাব দেখে, তাদের জ্ঞান ও পরমানন্দের প্রাপ্তি করিয়ে দেন।

পাঠকগণ, এবার শ্রী সাইবাবা কিভাবে থাকতেন, শুতেন ও শিক্ষা দিতেন- সে কথা শুনুন।

বাবার বিচিত্র বিছানা ঃ-

প্রথমে আমরা দেখব যে, বাবা কিভাবে শুতেন। শ্রী নানাসাহেব ডেঙ্গলে একটা চার হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া কাঠের তক্তা শ্রী সাইবাবার জন্য নিয়ে আসেন। তক্তাটা নীচে না বিছিয়ে, সেটাকে ঝুলিয়ে একটা দোলনার মত বানিয়ে, বাবা তাতে শোওয়া আরম্ভ করেন।

দোলনার দড়িগুলি একেবারে পাতলা ও ছেঁড়া হওয়ার দরুণ লোকেদের কাছে এই দোলনাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ দড়ির তো তক্তার ভার নেওয়ারই সামর্থ ছিল না। তবে বাবার শরীরের ভার কিভাবে বহন করত? যে ভাবেই হোক, সে তো ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু এটি তো বাবার একটি লীলাই বলতে হবে যে, ছেঁড়া দড়িগুলি তক্তা ও বাবার ভার সামলাচ্ছিল। বাবা কি ভাবে তক্তায় উঠে বসতেন ও শুতেন- এই দৃশ্য দেখা দেবতাদের জন্য দুর্লভ ছিল। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে এটাই ভাবত যে, বাবা কিভাবে তক্তায় উঠতেন ও নামতেন। কৌতূহলবশে লোকেরা রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য, এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু কেউই সেটা জানতে বা বুঝতে, পারেনি। একথা জানবার জন্য, ভিড় দিনের-পর-দিন বাড়তে লাগল। শেষে একদিন অতিষ্ট হয়ে, বাবা তক্তাটা ভেঙ্গে বাইরে ফেলে দিলেন। যদিও বাবা অষ্টসিদ্ধিতে পারদর্শী ছিলেন, তবুও তিনি সেগুলো কখনো ব্যবহার করেননি। সেগুলি সহজেই ও আপনা-আপনি বাবার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল।

ব্রহ্মের সগুণ অবতার ঃ-

বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী সাইবাবা সাড়ে তিন হাত লম্বা এক সামান্য

পুরুষ মনে হলেও, প্রত্যেকের হৃদয়ে তিনিই বিরাজমান। অন্তরে তিনি আসক্তিশূণ্য ও স্থির ছিলেন, কিন্তু বাইরে থেকে তাঁকে জনকল্যাণ হেতু সর্বদাই চিন্তিত মনে হতো। অন্তর হতে তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ছিলেন। ভক্তদের জন্য তাঁর হৃদয়ে পরম প্রেম ও শান্তি বিরাজমান ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে, তাঁকে অশান্ত মনে হতো। তিনি অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু বাহ্যরূপে সংসার চক্রে জড়িয়ে আছেন বলে মনে হতো। তিনি কখনো স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন, তো কখনো পাথর মারতেন, কখনো গালি-গালাজ দিতেন, তো কখনো বুকে জড়িয়ে ধরতেন। তিনি গম্ভীর, শান্ত, সহনশীল ছিলেন এবং সর্বদা নিজের ভক্তদের খেয়াল রাখতেন। সর্বদা একটা আসনের উপরে বিরাজমান থাকতেন। তাঁর দণ্ড একটা ছোট্ট লাঠি ছিল, যেটি তিনি সব সময় নিজের কাছেই রাখতেন। তিনি কাঞ্চন বা কীর্তির চিন্তা কখনো করেননি এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন নির্বাহ করেছেন। 'আল্লাহ মালিক' সর্বদা তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকত। ভক্তদের প্রতি অসীম ও বিশেষ ভালবাসা ছিল। আত্মজ্ঞানের খনি ও পরম দিব্যরূপ ছিলেন। একটি অপরিমিত, অনন্ত, সত্য ও অপরিবর্ত্তনশীল সিদ্ধান্ত (এই সমগ্র বিশ্ব যার অন্তর্ভুক্ত) শ্রী সাইবাবার মধ্যে আবির্ভূত হয়। এই অমূল্য রত্ন কেবল সৎ ও ভাগ্যবান ভক্তরাই প্রাপ্ত করে। যাঁরা শ্রী সাইবাবাকে কেবল সামান্য পুরুষ রূপে জেনেছেন, তাঁরা অবশ্যই অভাগা।

শ্রী সাইবাবার মা-বাবা ও তাঁর জন্মতিথির বিষয় ঠিক-ঠিক খবর কেউই জানে না। তবুও তাঁর শিরডী অবস্থানের সময় হিসাব করলে আনুমানিক ভাবে, সেটা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যখন প্রথম বার উনি শিরডী আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল কেবল **১৬** বছর। শিরডীতে

তিন বছর থাকার পর, কিছু সময়ের জন্য অন্তর্হিত হন। কিছুকাল পর ঔরঙ্গাবাদের কাছে (নিজাম স্টেটে) আবির্ভূত হন এবং চাঁদ পাটীলের শ্যালকের বরযাত্রীর সাথে, আবার শিরডী আসেন। সেই সময় তাঁর বয়স হবে, প্রায় **২০** বছর। তিনি **৬০** বছর শিরডীতে ছিলেন এবং **১৯১৮** সালে মহা সমাধিতে লীন হয়ে যান। এই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, তাঁর জন্ম **১৮৩৮** সালে হয়েছিল।

বাবার জীবনের লক্ষ্য এবং উপদেশ ঃ-

সপ্তদশ শতাব্দীতে **(১৬০৮-১৬৮১)** সন্ত রামদাসের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি মুসলমানদের দিয়ে গরু এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা করান। কিন্তু দু শতাব্দী পরই, হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ-বৈষম্য বেড়ে যায় এবং এটাই দূর করার জন্য, শ্রী সাইবাবা আবির্ভূত হন। তিনি সবাইকে একটাই উপদেশ দিতেন- "রাম (হিন্দুদের ভগবান) এবং রহীম (মুসলমানদের খোদা) একই এবং তাঁদের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র তফাৎ নেই। তবে কেন তাদের ভক্তরা পৃথক হয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি করবে? দুই সম্প্রদায় এক হয়ে মিলে-মিশে থাকো। শান্ত চিত্তে থেকে রাষ্ট্রীয় একতার লক্ষ্য প্রাপ্ত করো। কলহ ও বিবাদ ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। তাই লড়াই-ঝগড়া কোর না এবং পরস্পরের প্রাণঘাতক হয়ো না। সব সময় নিজের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা চিন্তা করো। শ্রীহরি তোমাদের রক্ষা নিশ্চয়ই করবেন। ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার অনেক পথ আছে যেমন, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা, জ্ঞান ইত্যাদি। যদি তুমি কোন রকম ভাবেই সফল সাধক না হতে পারো, তাহলে তোমার জন্ম বৃথা। **যে যতই তোমার নিন্দে করুক, তুমি তার প্রতিবাদ কোর না। যদি কোন ভালো কাজ করার ইচ্ছে থাকে,**

তাহলে সর্বদা অন্যের উপকার করো।" সংক্ষেপে সাইবাবার এই বক্তব্যই ছিল যে, উপরোক্ত আদেশানুসারে আচরণ করলে, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই, তোমার উন্নতি হবে।

সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু শ্রী সাইনাথ মহারাজ ঃ-

গুরু তো অনেক আছে। কিছু গুরু এমন দেখা যায়, যারা হাতে বীণা নিয়ে বাড়ী-বাড়ী ঘুরে বেড়ায় এবং নিজেদের ধার্মিকতা প্রদর্শিত করে। শিষ্যদের কানে মন্ত্র ফুঁকে তাদের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়। ওরা শুধু ভক্তি ও ধার্মিকতার ভান দেখায়। বস্তুতঃ তারা অসাধু ও অধার্মিক। শ্রী সাইবাবার মনে লোকেদের সামনে ধার্মিক নিষ্ঠা প্রদর্শন করার বিচার কখনোই আসেনি। দৈহিক আড়ম্বর তাঁকে কিঞ্চিৎমাত্র ছুঁতে পারেনি। কিন্তু ভক্তদের প্রতি তাঁর অসীম স্নেহ ছিল। গুরু দুরকমের হন- **১)** নিয়ত বা নির্দ্দিষ্ট **২)** অনিয়ত বা অনির্দ্দিষ্ট। অনিয়ত গুরুর উপদেশ পালন করলে, আমাদের উত্তম গুণগুলির বিকাশ হয় এবং মন শুদ্ধ হয়ে বিবেকের বৃদ্ধি হয়। উনি ভক্তিপথে লোকেদের প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু নিয়ত গুরুর সংস্পর্শে এলেই, দ্বৈত বুদ্ধি হ্রাস পেয়ে যায়। গুরু আরো অনেক ধরনেরও হয়, যারা বিভিন্ন প্রকারের সাংসারিক শিক্ষা প্রদান করে। যিনি আমাদের আত্মস্থ করে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেন, তিনিই আমাদের সদ্‌গুরু। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই সদ্‌গুরু। তাঁর মহিমা অবর্ণনীয়। যে ভক্তরা বাবার দর্শন করতে আসত, তাদের প্রশ্ন করার আগেই, বাবা ওদের সমস্ত জীবনের ত্রৈকালিক ঘটনাগুলির সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে দিতেন। তিনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন করতেন। শত্রু-মিত্র তাঁর কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিঃস্বার্থ ও দৃঢ় ছিলেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তাঁকে প্রভাবিত করতে পারত না। তিনি কখনও সংশয়গ্রস্ত হন নি।

দেহধারী হয়েও তাঁর দেহের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র আসক্তি ছিল না। দেহটি ছিল তাঁর জন্য একটা আবরণ মাত্র। তিনি তো নিত্যমুক্ত ছিলেন। সেই শিরডীবাসীরা ধন্য, যাঁরা শ্রী সাইবাবাকে ঈশ্বর রূপে উপাসনা করেছেন। উঠতে-বসতে, খেতে-পরতে, মাঠে বা বাড়ীতে যে কোন কাজই করুন না কেন, ওঁরা সর্বদাই বাবাকে স্মরণ ও তাঁর গুণগান করতেন। শ্রী সাইবাবা ছাড়া অন্য কোন ভগবানকে ওঁরা মানতেন না। শিরডীর নারীদের প্রেমের মাধুর্য্যের কথা তো বলাই যায় না। ওঁরা ছিলেন একেবারেই সরল ও সাদাসিধে। পবিত্র প্রেম ওঁদের গ্রাম্য ভাষায় ভজন লেখার প্রেরণা দিত। যদিও ওঁরা শিক্ষিত ছিলেন না, তবুও ওঁদের সরল ভজনের মাধ্যমে, প্রকৃত কাব্যের আভাস পাওয়া যেত। ওঁদের শুদ্ধ প্রেমই এই ধরনের কবিতার প্রেরণা হয়ে ছিল। কবিতা তো সত্য প্রেমেরই স্বরূপ। সর্বসাধারণের জন্য এই রকম লৌকিক গান অত্যাবশ্যক। হয়তো ভবিষ্যতে বাবার কৃপায় কোন ভাগ্যশালী ভক্ত গীত সংগ্রহের ভার নিয়ে এই গানগুলিকে সাইলীলা পত্রিকাতে কিংবা পুস্তক রূপে প্রকাশ করবেন।

বাবার বিনয় ঃ-

বলা হয় যে ভগবানের মধ্যে ছয় প্রকারের বিশেষ গুণ পাওয়া যায় - যেমন ১) কীর্তি ২) শ্রী ৩) বৈরাগ্য ৪) জ্ঞান ৫) ঐশ্বর্য্য এবং ৬) উদারতা। শ্রী সাইবাবার মধ্যে এই সব গুণগুলি বিদ্যমান ছিল। তিনি ভক্তদের ইচ্ছাপূর্তির জন্যই সগুণ অবতার ধারণ করেছিলেন। তাঁর কৃপা (দয়া) বড়ই বিচিত্র। ভক্তদের জন্য নিজের শ্রীমুখ থেকে এমন কথা বলতেন, যার বর্ণনা করতে মা সরস্বতীও সাহস করবেন না। তারই একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। বাবা অতি বিনম্র হয়ে বলতেন- "দাসানুদাস আমি তোমার ঋণী।" এটা কি রকমের

বিনয়? যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হত যে, বাবা বিষয় পদার্থ উপভোগ করছেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ প্রবৃত্তি কিঞ্চিৎমাত্রও ছিল না। তিনি খাবার তো নিশ্চয় খেতেন, কিন্তু তাঁর জিভে কোন স্বাদ ছিল না। তিনি চোখ দিয়ে দেখতেন, কিন্তু দৃশ্যের প্রতি কোন রুচি ছিল না। বাসনার ব্যাপারে তিনি হনুমানের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁর কোন পদার্থের প্রতি আসক্তি ছিল না। তিনি ছিলেন শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ যেখানে সমস্ত ইচ্ছা, অহংকার ও সব রকমের চেষ্টা লোপ পায়। সংক্ষেপে তিনি নিঃস্বার্থ, মুক্ত এবং পূর্ণ ব্রহ্ম ছিলেন। এই কথাটি বোঝাবার জন্য, একটি উৎকৃষ্ট ঘটনা এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হচ্ছে।

নানাবলী ঃ-

শিরডীতে নানাবলী নামে এক বিচিত্র ব্যক্তি থাকত। বাবার সব কাজের দেখাশোনার ভার তার উপর ছিল। একবার যে সময় বাবা নিজের আসনে বসেছিলেন, নানাবলী তাঁর কাছে এসে জানায় যে, সে ঐ আসনের উপর বসতে চায়। তাই সে বাবাকে সেখান থেকে সরে যেতে বলল। বাবা তক্ষুনি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং নানাবলী সেখানে গিয়ে বসে। একটু পরে নানাবলী সেখান থেকে উঠে, বাবাকে নিজের স্থান গ্রহণ করতে বলে। বাবা আবার নিজের আসন গ্রহণ করেন। এই দেখে নানাবলী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে। বাবা এই সমগ্র ব্যাপারটি দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রসন্ন হন নি।

সুগম পথ সাধু-সন্তদের কথা শ্রবণ ও সমাগম ঃ-

যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রী সাইবাবার আচরণ সামান্য পুরুষদের মতই মনে হত কিন্তু তাঁর কর্মের মাধ্যমে তাঁর অসাধারণ বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া

যেত। তিনি কখনও নিজের ভক্তদের কোন প্রাণায়াম বা যোগাসন বা বিশেষরকমের উপাসনার আদেশ দেননি। কখনও তাদের কানে মন্ত্র দেননি। তাঁর তো সবার জন্য একই মন্ত্র ছিল - **সব রকম চতুরতা ত্যাগ করে, সব সময় সাই-সাই স্মরণ করো। এই ধরনের আচরণ করলে সমস্ত বন্ধন কেটে যায় এবং মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।** পঞ্চাগ্নি, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনা কেবল ব্রাহ্মণদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যান্য শ্রেণীর কাছে তা কার্যকরী নয়।

মনের কাজ হচ্ছে চিন্তা করা। চিন্তা না করে সে এক দণ্ডও থাকতে পারে না। তাকে কোন বিষয়-বস্তুর সাথে সংলগ্ন করে দিলে মন তারই চিন্তন করে এবং যদি গুরুকে অর্পণ করে দাও, তাহলে তাঁরই চিন্তন করবে। আপনারা খুবই মন দিয়ে সাইয়ের মহানতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ করেছেন। এই কাহিনীগুলি সাংসারিক ভয় নির্মূল করে, আধ্যাত্মিক পথে আরুঢ় করে দেয়। তাই এই কথাগুলি সর্বদাই শ্রবণ এবং মনন করবেন। আচরণেও এগুলি মনে রাখবেন। যদি এইগুলি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণই নয়, বরং স্ত্রী ও অন্যান্য দলিত জাতিও শুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে যাবে। **সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থেকেও নিজের মনটা সাই ও তাঁর লীলাগানেই ডুবিয়ে রাখুন। তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কৃপা করবেন।** এত সরল পথ হওয়া সত্ত্বেও, সবাই এই পথ অবলম্বন করে না। ঈশ্বর কৃপার অভাবে সন্তদের কথা শোনার ইচ্ছে বা রুচি উৎপন্ন হয় না। তাঁর কৃপায় প্রত্যেক কাজ সুচারু ও সুন্দর ভাবে সফল হয়। সন্তদের কথা শ্রবণ করাই তাঁদের সান্নিধ্যের সমান এবং তার গুরুত্ব অনেক। এর দ্বারা দেহচেতনা, অহংকার এবং জন্ম-

মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি খুলে যায় এবং ঈশ্বরের সাথে মিলন ঘটে। বিষয়বস্তু থেকে নিশ্চয়ই বিরক্তি বাড়ে, সুখ-দুঃখে সুস্থির থাকার শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং শেষে আধ্যাত্মিক উন্নতি সুলভ হয়ে যায়। **যদি আপনি কোন সাধনাই, যেমন- নাম স্মরণ, পূজো বা ভক্তি ইত্যাদি না করতে পারেন, অনন্য ভাবে কেবল সন্তের শরণাগত হয়ে যান, তাহলেও তিনি আপনাকে খুব সহজে ভবসাগর পার করিয়ে দেবেন।** এই কাজের জন্যেই সন্তরা এই জগতে আবির্ভূত হন। পবিত্র নদীগুলি - গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি সংসারের সমস্ত পাপ ধূয়ে দেয়। কিন্তু তারাও সর্বদা কামনা করে যে, কোন মহাত্মা নিজের চরণ স্পর্শ দ্বারা তাদের পবিত্র করুন। সন্তদের মহিমাই এইরূপ। গত জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই শ্রী সাই চরণের প্রাপ্তি সম্ভব।

আমি শ্রী সাইয়ের মোহ বিনাশক চরণ ধ্যান করে, এই অধ্যায় সমাপ্ত করছি। তাঁর স্বরূপ কত সুন্দর ও মনোহর! মস্‌জিদের কোণে দাঁড়িয়ে 'উদী' বিতরণ করতেন। যিনি জগৎ মিথ্যা জেনে, সব সময় আত্মানন্দে নিমগ্ন থাকতেন, সেই সচ্চিদানন্দ শ্রী সাই মহারাজের চরণ কমলে আমার বারম্বার প্রণাম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১১

সগুণ ব্রহ্ম শ্রী সাইবাবা, ডাক্তার পণ্ডিতের পূজো, হাজী সিদ্দীক ফালকে, তত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ।

সগুণ ব্রহ্ম শ্রী সাইবাবা ঃ-

ব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ - নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুণ নিরাকার হয় ও সগুণ সাকার। যদিও দুটিই একই ব্রহ্মের দুই রূপ, তবুও কারো নির্গুণ উপাসনা, তো কারো সগুণ উপাসনা ভালো লাগে - যা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সগুণ উপাসনা সরল ও শ্রেষ্ঠ। মানুষের আকার আছে। তাই তার ঈশ্বরের সাকার উপাসনা স্বভাবতঃই সরল মনে হয়। কিছুকাল সগুণ উপাসনা না করলে, প্রেম ও ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। যেমন-যেমন সগুণ উপাসনায় আমাদের উন্নতি হতে থাকে, তেমন-তেমন নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে আমরা অগ্রসর হতে থাকি। তাই সগুণ উপাসনা দিয়েই শুরু করা উচিত। মূর্তি, বেদী, অগ্নি, আলো, সূর্য্য, জল এবং ব্রাহ্মণ উপাসনার - সাতটি লক্ষ্যবস্তু। তবে, সদ্‌গুরুই এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রী সাইয়ের স্বরূপ চোখের সামনে আনুন-যিনি বৈরাগ্যের প্রত্যক্ষ মূর্তি এবং অনন্যচিত্ত শরণাগত ভক্তদের আশ্রয়দাতা। তাঁর প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর পূজোর সংকল্পের দ্বারাই সমস্ত ইচ্ছা আপনা-আপনি পূরন হয়ে যায়।

কেউ-কেউ শ্রী সাইবাবাকে এক 'ভগবৎভক্ত' বা 'মহাভক্ত' বলেই মানত বা মানে। কিন্তু আমাদের জন্য তো, উনি ঈশ্বরাবতার। তিনি

অত্যন্ত ক্ষমাশীল, শান্ত ও সরল ছিলেন, যার কোন উপমাই দেওয়া যায় না। যদিও তিনি দেহধারী ছিলেন, কিন্তু আসলে নির্গুণ, নিরাকার, অনন্ত ও নিত্যমুক্ত। গঙ্গা নদী সমুদ্রের দিকে যাওয়ার পথে, গ্রীষ্মের উষ্ণতার দ্বারা পীড়িত প্রাণীদের শীতলতা প্রদান করে সুখী করে। ঠিক সেই রকমই শ্রী সাই জীবিত কালে, অন্যদের সান্ত্বনা ও সুখ প্রদান করতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন- "সন্তই আমার আত্মা।" এই অবর্ণনীয় ঐশ্বরিক শক্তিগুলি - সত্, চিত্ত, আনন্দ শিরডীতে সাই রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল। শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় উপনিষদ) ব্রহ্মকে 'আনন্দ' বলা হয়েছে। আজ অবধি এ কথা কেবল বইতেই পড়েছি বা শুনেছি। কিন্তু ভক্তরা শিরডীতে এই আনন্দ প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন। বাবা সবার আশ্রয়দাতা ছিলেন, তাঁর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হত না। তাঁর বসার জন্য ভক্তগণ একটা মোলায়েম (নরম) আসন ও একটা বড় বালিশ রাখত। বাবা ভক্তদের মনোভাব বিবেচনা করে, তাদের ইচ্ছানুসারে পূজানাদি করাতে কোন রকম আপত্তি করতেন না। কেউ আতর ও চন্দন লাগাত, তো কেউ পানসুপারি ও অন্যান্য বস্তু অর্পণ করত, কেউ বা নৈবেদ্য। যদিও দেখে মনে হত যে, শিরডীই তাঁর বাসস্থান, কিন্তু আসলে তিনি তো ছিলেন সর্বব্যাপী। এইরূপ সর্বব্যাপী গুরুদেবের চরণে আমার বারম্বার প্রণাম।

ডাক্তার পণ্ডিতের ভক্তি ঃ-

একবার শ্রী তাত্য়া নুলকরের বন্ধু, ডাক্তার পণ্ডিত বাবার দর্শনার্থে শিরডী আসেন। বাবাকে প্রণাম করে উনি মস্‌জিদে কিছুক্ষণ বসেন। বাবা ওঁকে শ্রী দাদাভট্ট কেলকরের বাড়ী যেতে বলেন, যেখানে ওঁর খুব ভালোভাবে অভ্যর্থনা হয়। তারপর দাদাভট্ট ও ডাক্তার পণ্ডিত একসাথে বাবার পূজোর জন্য মস্‌জিদে পৌঁছন। প্রথমে দাদাভট্ট

বাবার পূজো করেন। বাবার পূজো-অর্চনা তো প্রায় সবাই করত, কিন্তু তাঁর শুভললাটে চন্দন লাগাবার সাহস কখনো কারো হয়নি। শুধু মহালসাপতি তাঁর গলায় চন্দন লাগাতেন। কিন্তু সেদিন ডাক্তার পণ্ডিত পূজোর থালা থেকে চন্দন নিয়ে, বাবার কপালে ত্রিপুণ্ড্র এঁকে দেন। বাবা একটি শব্দও বললেন না। ভক্তরা অবাক হয়ে এই দৃশ্যটি দেখল। সন্ধ্যাবেলা দাদা ভট্ট আর থাকতে না পেরে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি তো কাউকে কপালে চন্দন লাগাতে দেন না, কিন্তু ডাক্তার পণ্ডিতকে কেন কিছু বললেন না?" বাবা এর উত্তরে বললেন- "ডাক্তার পণ্ডিত, তাঁর গুরু শ্রী রঘুনাথ মহারাজ ধোপেশ্বরকে (যিনি কাকা পুরানীকের নামে প্রসিদ্ধ) যেভাবে চন্দন লাগাতেন, ঠিক সেই ভাবনার বশীভূত হয়ে, আমার কপালে চন্দন লাগান। এবার বলো, আমি কি করে তাঁকে বাধা দিতাম?" ডাক্তার পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করাতে উনি দাদাভট্টকে বললেন- "আমি বাবাকে নিজের গুরু কাকা পুরানীকের মত মনে করে তাঁকে চন্দন লাগিয়ে ছিলাম, যেভাবে আমি আমার গুরুকে লাগাই।"

যদিও বাবা ভক্তদের তাদের ইচ্ছেমত পূজো করতে দিতেন, তবুও কখনো-কখনো তাঁর ব্যবহার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হত। যখন তিনি পূজোর থালা ফেলে দিয়ে রুদ্রাবতার ধারণ করতেন, তখন তাঁর কাছে যাওয়ার সাহস কারো হত না। কখনো তিনি ভক্তদের বকতেন, তো কখনো মোমের চেয়েও নরম হয়ে, শান্তি ও ক্ষমামূর্তির ন্যায় ব্যবহার করতেন। কখনো-কখনো রাগে কাঁপতেন ও তাঁর চোখ দুটি লাল হয়ে যেত, তবুও তাঁর হৃদয়ে প্রেম ও মাতৃস্নেহের স্রোত বইত। ভক্তদের কাছে ডেকে বলতেন যে তিনি তো জানতেই পারেননি যে, কোন্ সময় তিনি তাদের উপর রেগে উঠেছিলেন।

বাবা (সমুদ্রের মত) ভক্তরূপী নদীগুলির উপর রাগ করে কখনো কি তাদের ফিরিয়ে দিতে পারেন বা তাদের উপেক্ষা করতে পারেন? তিনি তো ভক্তদের কাছেই থাকেন ও ভক্তরা যখন তাঁকে ডাকে তিনি তক্ষুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে যান। তিনি সর্বদাই ভক্তদের ভালবাসা পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে থাকেন।

হাজী সিদ্দীক ফালকে ঃ-

কখন শ্রী সাইবাবা কোন্ ভক্তকে নিজের কৃপাছায়ায় টেনে নেবেন সেটা কেউই বলতে পারত না। এটা শুধুমাত্র তাঁরই উপর নির্ভর করত। হাজী সিদ্দীক ফালকের কাহিনী, এর একটি উদাহরণ। কল্যাণনিবাসী এক মুসলমান, যাঁর নাম সিদ্দীক ফালকে ছিল, মক্কা শরীফের 'হজ' যাত্রা করে শিরডী আসেন। তিনি চাওড়ীর উত্তর দিকে থাকতে শুরু করেন। মস্‌জিদের সামনে খোলা উঠোনটায় বসতেন। বাবা ওঁকে ন'মাস মস্‌জিদে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি। এমনকি মস্‌জিদের সিঁড়িও চড়তে দেননি। ফালকে খুবই নিরাশ হন এবং উনি এটা ভেবে উঠতে পারেন না যে কোন্ উপায় কার্য্যকরী হতে পারে। লোকেরা ওঁকে নিরাশ না হয়ে, বাবার অন্তরঙ্গ ভক্ত শামার সাহায্যে, বাবার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করতে বলে। যে ভাবে ভগবান শিবের দরবারে পৌঁছানোর জন্য, নন্দীর কাছে যাওয়া আবশ্যক, তেমনি বাবার কাছেও শামার মাধ্যমেই যাওয়া উচিত। ফালকের এই পরামর্শটি ভালো লাগে এবং উনি শামাকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করেন। শামাও তাঁকে আশ্বাস দেন এবং সুযোগ পেয়ে বাবাকে বললেন- "বাবা, আপনি এই বুড়ো হাজীকে মস্‌জিদে কেন ঢুকতে দিচ্ছেন না? কত ভক্ত ইচ্ছেমত আপনার দর্শন করতে আসে-যায়। কিছু না হোক, একবার ওঁকে আশিস তো দিয়ে দিন।" বাবা বললেন-

"শামা, তুমি এখনো অনভিজ্ঞ। যদি ফকির (আল্লাহ) অনুমতি না দেন, তাহলে আমিই বা কি করি? তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ এই মস্‌জিদের সিঁড়ি চড়তে পারে না। আচ্ছা ওকে জিজ্ঞেসা করো, যে ও কি দ্বাদশ কূপের কাছে নীচু সংকীর্ণ রাস্তাটায় আমার সাথে দেখা করতে পারে?" শামা সম্মতিসূচক উত্তর নিয়ে ফেরেন। তখন বাবা আবার শামাকে বলেন- "ও কি আমায় চারটে কিস্তিতে চল্লিশ হাজার টাকা দিতে রাজী আছে?" শামা এই উত্তর নিয়ে ফেরেন যে- "আপনি যদি চল্লিশ লাখ টাকাও চান তো দিতে রাজী আছি।" "আমি একটা পাঁঠা কাটতে চাই, ওকে জিজ্ঞাসা করো যে, ও তার মাংস খেতে চায় না তার অণ্ডকোষ?" শামা এসে জানান যে, বাবার খাবার পাত্র থেকে একটি গ্রাস পেলেই, হাজী নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে। এই উত্তরটি শুনে বাবা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং মাটির ঘড়াটা ফেলে দিয়ে নিজের কফ্‌নীটা (খাপনি) উপরে উঠিয়ে সোজা হাজীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। "শুধু-শুধু নমাজ কেন পড়ো? নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন কেন করো? এ রকম বৃদ্ধ হাজীদের মত বেশভূষা কেন ধারণ করে আছো? এই রকম কোরান পড়েছ তুমি? তোমার নিজের মক্কা যাত্রার অহংকার হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি এখনো আমায় চেনোনি।" এই ভাবে বকুনি খেয়ে হাজী ঘাবড়ে গেল। বাবা মস্‌জিদে ফিরে আসেন এবং কিছু আমের টুকরী কিনে হাজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর থেকেই বাবা হাজীকে ভালবাসতে শুরু করেন এবং একত্রে বসে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতেন। এবার হাজীও নিজের ইচ্ছানুযায়ী মস্‌জিদে আসা-যাওয়া শুরু করেন। কখনো-কখনো বাবা ওঁকে কিছু টাকাও দিতেন। এই ভাবে হাজী বাবার দরবারে সম্মিলিত হয়ে যান।

বাবার পঞ্চভূত নিয়ন্ত্রণ ঃ-

বাবার পঞ্চভূতের উপর নিয়ন্ত্রণ স্বরূপ দুটি ঘটনা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শেষ করা হচ্ছে -

১) একবার সন্ধ্যার সময় শিরডীতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হয়। আকাশ ঘন ও কালো মেঘে ঢাকা ছিল। খুব জোরে হাওয়া বইছিল এবং বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। যেদিকেই চোখ যায়, সেদিকেই শুধু জল। সব পশু-পাখী ও শিরডীবাসীরা ভয়ানক ভয় পেয়ে মস্‌জিদে একত্রিত হয়েছিল। শিরডীতে গ্রাম দেবদেবী তো অনেক আছেন, কিন্তু ঐ দিন সাহায্য করতে, কেউ এলেন না। তাই সবাই নিজেদের ভগবান শ্রী সাইকে, যিনি শুধু তাদের ভক্তিই একান্ত ভাবে কামনা করতেন, বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রার্থনা করে। বাবা তাদের ভক্তিতে মুগ্ধ ও বিচলিত হয়ে, বাইরে বেরিয়ে আসেন। মস্‌জিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে, মেঘের দিকে তাকিয়ে, গম্ভীর স্বরে বলেন- "ব্যস্, এবার শান্ত হও।" কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টির জোর কম হয়ে পড়ে এবং ঝড় শান্ত হয়ে যায়। আকাশে চাঁদ দেখে সব লোকেরা প্রসন্ন মনে নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

২) আরেক দিন, মধ্যাহ্নের সময় ধুনির আগুন এতো প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে, অগ্নিশিখা ছাদ ছুঁতে লাগল। মস্‌জিদে উপস্থিত লোকেরা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, জল ঢেলে ধুনির আগুন শান্ত করা উচিত অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। বাবাকে জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো ছিল না।

কিন্তু বাবা শীঘ্রই পরিস্থিতিটি জানতে পেরে যান। তিনি নিজের দণ্ডটি উঠিয়ে সামনের থামের উপর সজোরে আঘাত করে বলতে

লাগলেন- "নীচে নামো, শান্ত হয়ে যাও।" প্রত্যেক আঘাতের প্রভাবে শিখাগুলির প্রচণ্ডতা কম হতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুনি শান্ত ও আগের রূপ ধারণ করে। শ্রী সাই ঈশ্বরের অবতার। যে তাঁর সামনে নত হয়ে তাঁর শরণে যাবে, তিনি তার উপর অবশ্যই কৃপা করবেন। যে ভক্ত, এই অধ্যায়ের কাহিনীগুলি প্রতিদিন শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্বক পাঠ করবে, সে দুঃখ হতে শীঘ্রই পরিত্রাণ পাবে। শুধু তাই নয়, সে সর্বদাই শ্রীচরণে লিপ্ত থাকবে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন প্রাপ্ত হয়ে, তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে এবং এভাবে সে নিষ্কাম হয়ে যাবে।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১২

১) কাকা মহাজনী ২) ধূমাল উকিল ৩) শ্রীমতি নিমোনকর ৪) নাসিকের মূলে শাস্ত্রী ৫) একটি ডাক্তারের অভিজ্ঞতা (বাবার লীলার)

বাবা ভক্তদের সাথে কিভাবে সাক্ষাৎকার করতেন এবং কিরূপ ব্যবহার করতেন, তার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হয়েছে।

সন্তদের কার্য্য ঃ-

ঐশ্বরিক অবতারদের উদ্দেশ্য সাধুজনদের পরিত্রাণ এবং দুষ্টদের সংহার করা। কিন্তু সৎপুরুষদের কার্য্য তো একেবারেই ভিন্ন। সন্তদের জন্য সাধু ও দুষ্ট প্রায় একরূপ। আসলে দুষ্কর্ম যারা করে, তাদের জন্যই তাঁদের বেশী চিন্তা এবং তাদের ঠিক পথে নিয়ে আসাটা, তাঁদেরই কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ভবসাগরের দুঃখ শুকিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগস্ত্য মুনি এবং অজ্ঞানের অন্ধকার নাশ করার জন্য সূর্য্যের সমান। সন্তদের হৃদয়ে ভগবান বাসুদেব বাস করেন। তাঁরা বাসুদেবের থেকে পৃথক নন। শ্রী সাইবাবা এই শ্রেণীরই অবতার, যিনি শুধু ভক্তদের কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি জ্ঞান-জ্যোতিস্বরূপ ও তাঁর দিব্যপ্রভা অপূর্ব। তাঁর কাছে শত্রু, মিত্র, রাজা, ভিক্ষুক সবাই সমান। পাঠকগণ, এবার মন দিয়ে তাঁর কীর্তি শ্রবণ করুন। বাবা ভক্তদের জন্য নিজের দিব্য গুণ সমূহ পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করতেন এবং সততই তাদের সাহায্য করার জন্য তৎপর থাকতেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাঁর কাছে পৌঁছতে পারত না। ওদের শুভ মুহূর্ত উদিত

না হয়ে থাকলে বাবার স্মৃতি বা তাঁর লীলা গান তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। তাহলে বাবার দর্শনের অভিলাষ মনে উৎপন্ন হওয়া কিভাবে সম্ভব হত? অনেক লোকের শ্রী সাইবাবার দর্শনের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, তাঁর সমাধি পর্যন্ত, কোন সংযোগ ঘটেনি। অতএব এরকম লোকেরা যাঁরা বাবার দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত রয়ে গেছেন, তাঁরা যদি শ্রদ্ধাপূর্বক সাই লীলাগুলি শ্রবণ (বা পাঠ) করেন, তাহলে তাঁদের সাই দর্শনের সেই পিপাসা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়ে যাবে। সৌভাগ্যবশতঃ যাঁরা কোন প্রকারে বাবার কাছে গিয়ে তাঁর দর্শন পেতেন, তাঁরাও বেশীদিন সেখানে থাকতে পারতেন না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও, কেবল যতদিন বাবা থাকতে অনুমতি দিতেন ততদিনই সেখানে থাকতে পারতেন এবং বাবার আদেশ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেখান থেকে চলে যেতে হত। অতএব এসব তাঁর দৈবিক ইচ্ছার উপরই নির্ভর করত।

কাকা মহাজনী ঃ-

এক সময় কাকা মহাজনী বম্বে থেকে শিরডী যান। ওঁর ইচ্ছে ছিল এক সপ্তাহ সেখানে থেকে, গোকুল অষ্টমীর উৎসবে সম্মিলিত হবেন। দর্শনের পর বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "তুমি কবে যাচ্ছো?" প্রশ্নটা শুনে কাকা মহাজনী একটু আশ্চর্য্যই হন। উত্তর তো একটা দিতেই হবে। তাই উনি বলেন- "যখন বাবা আজ্ঞা করবেন।" বাবা পরের দিনই ফিরে যেতে বলেন। বাবার এক-একটি শব্দ বেদবাক্যর মত মানা হত এবং সেগুলি অলঙ্ঘ্যনীয়। কাকা মহাজনী আদেশানুসারে সেখান থেকে রওনা হয়ে যান। বম্বেতে অফিস পৌঁছে দেখেন যে, তাঁর শেঠ তাঁর জন্য অতি উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর ম্যানেজার অসুস্থ হয়ে পড়ায়, কাকার উপস্থিতি অত্যাবশক হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। শেঠ শিরডীতে কাকার নামে যে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন, সেটা বম্বের ঠিকানায় ওঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভাউ সাহেব ধূমাল ঃ-

এবার একটা বিপরীত ঘটনা শুনুন। একবার ভাউ সাহেব একটি মোকদ্দমার ব্যাপারে নিফাডের আদালতে যাচ্ছিলেন। পথে উনি শিরডীতে নামেন। বাবার দর্শন করেই তক্ষুনি নিফাডের জন্য রওনা হতে উদ্যত হন, কিন্তু বাবার অনুমতি পান না। বাবা ওঁকে শিরডীতে আরো এক সপ্তাহ থাকতে আদেশ দেন। এর মধ্যে নিফাডের ম্যাজিষ্ট্রেট পেটের কষ্টে অত্যন্ত কাবু হয়ে পড়েন। তাই ভাউয়ের মোকদ্দমার দিন পেছিয়ে দেওয়া হয়। এক সপ্তাহ পর ভাউসাহেব রওনা হওয়ার অনুমতি পান। এই মোকদ্দমার শুনানি কয়েকমাস ধরে চলে ও চারজন বিচারকের সামনে পেশ করা হয়। অবশেষে ধূমাল মোকদ্দমাটি জিতে যান এবং ওঁর মক্কেল নির্দোষ ঘোষিত হয়।

শ্রীমতি নিমোনকর ঃ-

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী নানাসাহেব নিমোনকর, এক সময় নিজের স্ত্রীর সাথে শিরডীতে এসে থাকছিলেন। নিমোনকর ও তাঁর স্ত্রী অনেকটা সময় বাবার সেবায় ও পবিত্র সঙ্গে কাটাতেন। একবার এমন হলো যে, ওঁদের পুত্র বেলাপুরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাই শ্রীমতি নিমোনকর সেখানে গিয়ে ছেলেকে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে দেখা করে কিছুদিন সেখানে থেকে আসবেন - এরকম মনে-মনে ঠিক করেন। কিন্তু শ্রী নিমোনকর তাঁকে পরের দিনই ফিরে আসতে বলেন। শ্রীমতি নিমোনকর একটু সমস্যায় পড়ে যান। কিন্তু বাবা তার উপায় করে দেন। সাঠেওয়াড়ার কাছে, বাবা নানাসাহেব ও আরো

কিছু ভক্তদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্রীমতি নিমোনকর বাবার চরণ বন্দনা করে প্রস্থান করার অনুমতি চান। বাবা বলেন- "তাড়াতাড়ি যাও, ঘাবড়াবার কিছু নেই। শান্ত মনে বেলাপুরে চারদিন আনন্দ করে থেকে, সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে তারপরই শিরডী ফিরো।" বাবার শব্দগুলি কি দারুণ সময়োপযোগী হয়েছিল! শ্রী নিমোনকরের আদেশ বাবা খারিজ করে দেন।

নাসিকের মূলে শাস্ত্রী জ্যোতিষী ঃ-

নাসিকে এক কর্মনিষ্ঠ, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ওঁর নাম ছিল মূলে শাস্ত্রী। উনি ছটি শাস্ত্রের অধ্যয়ন করেছিলেন ও জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রেও ওঁকে পটু মানা হত। উনি একবার নাগপুরের প্রসিদ্ধ ধনী শ্রী বাপু সাহেব বুটী ও অন্যান্য ভক্তদের সাথে বাবার দর্শন করতে আসেন। বাবা অনেক রকম ফল কিনে মস্‌জিদে উপস্থিত লোকেদের সেগুলি বিতরণ করছিলেন। এমন সুন্দর ভাবে আমগুলি চারদিক দিয়ে টিপতেন যে, চোসামাত্রই সমস্ত রসটা মুখে এসে যেত। আঁটি ও খোসা সহজেই আলাদা হয়ে যেত। বাবা কলার খোলা ছাড়িয়ে সব ভক্তদের দিলেন ও খোসাগুলি নিজের কাছে রেখে নিলেন। মূলে শাস্ত্রী বাবার হাত দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু বাবা ওঁর অনুরোধে কান না দিয়ে, ওঁকে চারটে কলা দেন। এরপর সবাই ওয়াড়ায় ফিরে আসে। এবার মূলে শাস্ত্রী স্নান করে পূজোর জোগাড় শুরু করেন। বাবাও নিজের নিয়মানুসারে 'লেণ্ডী'-র দিকে বেরিয়ে পড়েন। যেতে-যেতে উনি বলেন- "কিছু গেরুয়া রং আনো, আজ আমার বস্ত্র গেরুয়া রঙ করব।" বাবার কথার অভিপ্রায় কেউ বুঝতে পারে না। কিছুক্ষণ পর বাবা ফিরে আসেন। দুপুরের আরতির জোগাড় চলছিল। বাপু সাহেব যোগ মূলেকে আরতির সময় যাবেন

কিনা জিজ্ঞেস করেন। তাতে মূলে জানান যে, উনি সন্ধ্যার সময় বাবার দর্শন করতে যাবেন। তখন যোগ একলাই প্রস্থান করেন। বাবা আসনে বসতেই, ভক্তরা পূজো আরম্ভ করে দেয়। এবার আরতি শুরু হয়ে যায়। বাবা হঠাৎ বলেন- "ঐ ব্রাহ্মণটির কাছ থেকে কিছু দক্ষিণা আনো।" বুটী স্বয়ং দক্ষিণা নিতে যান এবং বাবার বার্তা মূলে শাস্ত্রীর কাছে ব্যক্ত করেন। মূলে শাস্ত্রী বেশ চিন্তায় পড়ে যান-"আমি তো এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, আমার কি দক্ষিণা দেওয়া উচিত হবে? যদিও বাবা এক মহান সন্ত, কিন্তু আমি তো তাঁর শিষ্য নই।" তবুও ওঁর মনে হয় যে, যখন বাবার ন্যায় মহান সন্ত দক্ষিণা চাইছেন ও বুটীর মতন এক লক্ষপতি সেটা নিতে এসেছেন, তখন সেটা অগ্রাহ্য করা যায় না। এই ভেবে নিজের কৃত্যটি অপূর্ণ রেখেই, বুটীর সঙ্গে মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছন। নিজেকে পবিত্র ও মস্‌জিদ অপবিত্র- এই ভেবে, খানিকটা দূরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখান থেকেই হাত জুড়ে বাবার উপর ফুল ফেলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড। হঠাৎ বাবার জায়গায়, সেই আসনে ওঁর গুরু কৈলাশবাসী ঘোলপ স্বামীকে বিরাজমান দেখেন। নিজের গুরুকে ওখানে দেখে উনি খুব আশ্চর্যান্বিত হন। 'এটা কোন স্বপ্ন নয় তো? না। না! এটা স্বপ্ন নয়। আমি তো সম্পূর্ণ রূপে জাগ্রত। কিন্তু আমার গুরু মহারাজ এখানে কি করে পৌঁছলেন?' কিছুক্ষণ তো ওঁর মুখ থেকে একটি শব্দও বেরোয় না। উনি নিজেকে চিমটি কাটেন এবং আবার সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করেন। কিন্তু তবুও বুঝতে পারেন না যে, ওঁর কৈলাসবাসী গুরু ঘোলপ স্বামী মস্‌জিদে কি করে পৌঁছলেন? তারপর সমস্ত সন্দেহ মিটিয়ে এগিয়ে যান এবং 'গুরুর' চরণে পড়ে, হাত জুড়ে স্তুতি করতে শুরু করেন। অন্যান্য ভক্তরা বাবার আরতি গাইছিল, কিন্তু মূলে শাস্ত্রী জোর গলায় নিজের

গুরুর নামকীর্তন করছিলেন। এবার সব জাত-পাতের অহংকার এবং পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণা ত্যাগ করে, উনি গুরুর শ্রী চরণে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখেন বাবা দক্ষিণা চাইছেন। বাবার আনন্দস্বরূপ এবং তাঁর অনির্বচনীয় শক্তি দেখে মূলে শাস্ত্রী আত্ম বিস্মৃত হয়ে যান। ওঁর আনন্দের সীমা রইল না। চোখ আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হচ্ছিল। বাবাকে পুনঃ নমস্কার করে এবং দক্ষিণা দিয়ে উনি বলেন- "আমার সব সংশয় আজ দূর হয়ে গেছে। আজ আমি আমার গুরুর দর্শন পেয়েছি।" বাবার এই অদ্ভুত লীলা দেখে ভক্তগণ ও মূলে শাস্ত্রী বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান। "গেরুয়া রং আনো - আজ বস্ত্র গেরুয়া রঙ করা হবে" - বাবার এই শব্দগুলির অর্থ এবার সবাই বুঝতে পারল। এমন অদ্ভুত মহিমা ছিল শ্রী সাইবাবার।

ডাক্তার ঃ-

একবার এক মাম্‌লৎদার নিজের এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে শিরডী আসেন। ডাক্তারের বক্তব্য ছিল- "শ্রীরাম আমার ইষ্টদেব। আমি কোন মুসলমানের সামনে নতমস্তক হব না। অতএব আমি শিরডী যেতে রাজী নই।" মাম্‌লৎদার ওঁকে বোঝান- "প্রণাম করতে তোমায় কেউ বাধ্য করবে না। তুমি আমার সাথে চলো, ভালো লাগবে।" শিরডী পৌঁছে ওঁরা বাবার দর্শন করতে যান। কিন্তু ডাক্তারকেই সব থেকে আগে এগিয়ে যেতে এবং সর্বাগ্রে বাবার চরণ বন্দনা করতে দেখে, সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে। লোকেরা আর থাকতে না পেরে, ওঁকে জিজ্ঞাসা করে বসে যে, ওঁর হৃদয় পরিবর্তন কিভাবে ঘটল? একজন মুসলমানকে কি করে প্রণাম করে ফেললেন? ডাক্তার জানান যে, উনি বাবার স্থানে নিজের ইষ্টদেব শ্রীরামের দর্শন পেয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিলেন। এই বলতে-বলতেই আবার শ্রী সাইবাবাকে সেখানে

বসে থাকতে দেখেন। উনি আশ্চর্য্য হয়ে বলেন-"এটা কি স্বপ্ন? ইনি তো পূর্ণ যোগ অবতার।" পরের দিন থেকে উনি উপবাস শুরু করেন এবং এই স্থির করেন যে, যতক্ষন বাবা নিজে ডেকে আশীর্বাদ না দেবেন, ততক্ষন মস্‌জিদে কদাপি যাবেন না। এই ভাবে তিনদিন কেটে গেল। চতুর্থ দিন ওঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু খানদেশ থেকে শিরডী আসেন। ওঁরা দুজনে বাবাকে দর্শন করতে মস্‌জিদে এলেন। প্রণাম ইত্যাদি হওয়ার পর বাবা ডাক্তারকে বলেন- "আপনাকে ডাকবার কষ্ট কে করল? আপনি এখানে কি করে এলেন?" এই প্রশ্নটি শুনে ডাক্তার তো একেবারে অবাক। সেই রাত্রিতেই বাবার ওঁর উপর কৃপা হয়। ডাক্তার নিদ্রাতেই পরমানন্দের অনুভূতি পান। বাড়ী ফিরে আসার পরও পনেরো দিন পর্যন্ত সেই দিব্য অনুভূতিতে নিমগ্ন ছিলেন। এই ভাবে ওঁর সাইভক্তি অনেক গুণে বেড়ে যায়।

এই ঘটনাগুলির, বিশেষতঃ মূলে শাস্ত্রীর গল্পটির, শিক্ষা এই যে আমাদের নিজের গুরুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। পরের অধ্যায়ে বাবার অন্যান্য লীলা বর্ণনা করা হবে।

।। শ্রী সাঁইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১৩

অন্য কয়েকটি লীলা - ১) ভীমাজী পাটীল ২) বালা গণপত দর্জী ৩) বাপুসাহেব বুটী ৪) আলন্দী স্বামী ৫) কাকা মহাজনী ৬) হরদার দত্তোপন্ত

মায়ার অভেদ্য শক্তি ঃ-

বাবার বক্তব্য সর্বদা সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ, গূঢ় ও বিদ্যাভূষিত হত। তিনি সদাই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়ে থাকতেন। তাঁর কথায় "আমি একজন ফকির, আমার না স্ত্রী আছে আর না আছে ঘর-বাড়ি। সব চিন্তা ত্যাগ করে আমি একই স্থানে থাকি। তবুও মায়া আমায় বিরক্ত করে। আমি নিজেকে তো ভুলে গেছি, কিন্তু মায়া আমায় ভুলছে না, কারণ সে আমায় নিজের চক্রে জড়িয়ে নিতে চায়। শ্রীহরির এই মায়া, ব্রহ্মাদিকেও ছাড়ে না, তবে আমার মত এক ফকির তো কোন ছাড়? কিন্তু যারা শ্রীহরির শরণ নেবে, তারা তাঁর কৃপায়, মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।" এই ভাবে বাবা মায়ার শক্তির পরিচয় দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে উদ্ধবকে বলেন- "সন্তই আমার জীবিত স্বরূপ।" এবং বাবাও এ কথা বলতেন-**"তারা খুবই ভাগ্যবান যাদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। তারাই আমার উপাসনার দিকে অগ্রসর হতে পারে বা হয়। যদি তুমি শুধু 'সাই' 'সাই'-ই স্মরণ করতে থাকো, তাহলেও আমি তোমায় ভবসাগর পার করিয়ে দেব। এই শব্দগুলির ওপর বিশ্বাস করো, তুমি নিশ্চয়ই লাভ**

পাবে। আমার পূজোর জন্য কোন সামগ্রী বা অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার দরকার হয় না। আমি তো ভক্তিতেই বাস করি।" এবার দেখা যাক অনাশ্রিতদের আশ্রয়দাতা সাই, ভক্তদের কল্যাণের জন্য কি-কি দেন বা করেন।

ভীমাজী পাটীল ঃ সত্য সাই ব্রত ঃ-

নারায়ণ গ্রামের (তালুক জুন্নর, জেলা পুনা) এক ভদ্রলোক ভীমাজী পাটীল, ১৯০৯ সালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। উনি অনেক রকমের চিকিৎসা করান, কিন্তু কোন লাভ হয় না। শেষে হতাশ হয়ে উনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন- "হে নারায়ণ! হে প্রভু! এই অনাথকে কিছু সাহায্য করো।" আমরা যখন সুখে থাকি তখন ভগবানকে স্মরণ করি না, কিন্তু যেই দুর্ভাগ্য জর্জরিত করে তোলে এবং দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হয়, তখন ভগবানের কথা মনে পড়ে। তাই ভীমাজীও ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। হঠাৎ ওঁর মনে হলো, শ্রী সাইবাবার পরম ভক্ত, শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে পরামর্শ করলে কেমন হয়? তাই নিজের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে, ওঁকে পথ প্রদর্শন করতে প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে নানাসাহেব লেখেন- "এখন শুধু একটাই উপায় রয়ে গেছে এবং সেটা হলো শ্রী সাইবাবার চরণে শরণাগতি।" নানাসাহেবের কথা বিশ্বাস করে ভীমাজী শিরডী যাত্রার ব্যবস্থা শুরু করেন। ওঁকে শিরডী আনা হয় এবং মস্‌জিদে এনে শোওয়ান হয়। শ্রী নানাসাহেব ও শামাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাবা বললেন- "এ সব পূর্ব জন্মের দুষ্কর্মের ফল, তাই আমি এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাই না।" এই কথা শুনে রোগী অত্যন্ত নিরাশ হয়ে করুণ স্বরে মিনতি করেন- "বাবা,

আমি একেবারে নিঃসহায় এবং শেষ আশা নিয়ে আপনার শ্রীচরণে এসেছি। আপনার কাছে দয়ার ভিক্ষে চাইছি। হে দীনের একমাত্র শরণ! আমার উপর দয়া করুন।" এই হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা শুনে বাবা দ্রবীভূত হয়ে বললেন- "আচ্ছা দাঁড়াও। চিন্তা করো না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। **কারো হাজার যাতনা বা কষ্ট হোক না কেন, এই সিঁড়ির উপর পা রাখতেই, তার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। মস্‌জিদের ফকির খুব দয়ালু এবং সে তোমার রোগও নির্মূল করে দেবে। সে তো প্রেম ও দয়ার সাগর এবং সবাইকে রক্ষা করে।"** রোগী প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর রক্ত-বমি করত। কিন্তু বাবার এই ঘোষণার পর, রোগটি ভালোর দিকে ঘুরল। বাবা যে স্থানে ভীমাজীকে থাকতে আদেশ করেন, সে জায়গাটি রোগীর জন্য সুবিধেজনক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ তো ছিল না কিন্তু বাবার আজ্ঞা অবহেলাই বা কে করতে পারত? সেখানে থাকাকালীন দু'টো স্বপ্ন দিয়ে, বাবা ওর রোগ হরণ করে নেন। প্রথম স্বপ্নে, রোগী দেখে যে, একটি বিদ্যার্থী শিক্ষকের সামনে কবিতা মুখস্থ না করতে পারার জন্য দণ্ডস্বরূপ বেতের মারের অসহ্য কষ্ট ভোগ করছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখে যে কেউ যেন বুকের নীচের থেকে উপর এবং উপর থেকে নীচে পাথর ঘোরাচ্ছে, যার দরুণ তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। স্বপ্নে এই রকম কষ্ট পেয়ে, ভীমাজী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং বাড়ী ফিরে আসেন। তারপর থেকে উনি কখনো-কখনো শিরডী আসতেন এবং বাবার কৃপা ও দয়ার কথা মনে করে, বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। **বাবা নিজের ভক্তদের কাছে কোন বস্তুর আশা রাখতেন না। উনি তো শুধু স্মরণ, দৃঢ় নিষ্ঠা ও ভক্তিই চাইতেন।**

মহারাষ্ট্রের লোকেরা চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রতিপক্ষ বা প্রতি মাস শ্রী সত্যনারায়ণের ব্রত করে। কিন্তু নিজের গ্রামে ফিরে ভীমাজী পাটীল, শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রতের জায়গায় একটা নতুন ব্রত 'সত্য সাই ব্রত' শুরু করেন।

বালা গণপত শিম্পি ঃ-

বালা গণপত শিম্পি, বাবার আরেক ভক্ত, একবার ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছিলেন। সব রকম ওষুধ-পথ্যের দ্বারাও কোন লাভ হয় না। যখন জ্বর বিন্দুমাত্র কমে না, তখন উনি শিরডী আসেন এবং বাবার শ্রীচরণে শরণ নেন। বাবা ওকে এক বিচিত্র আদেশ দেন- "লক্ষ্মী মন্দিরের কাছে একটা কালো কুকুরকে একটু দৈ-ভাত খাওয়াও।" বালা এই আদেশ পালন করার উপায় বুঝে উঠতে পারছিলেন না। যাই হোক, একটু ভাত ও দৈ নিয়ে লক্ষ্মী মন্দির পৌঁছান। সেখানে একটা কালো কুকুর দেখতে পেয়ে সহজেই খাওয়াতে পারলেন। শ্রী বাবার চরিত্রের ব্যাখ্যান কোন মুখ দিয়ে করি যে, এর পরই বালা শিম্পির জ্বর একেবারে সেরে গেল।

বাপু সাহেব বুটী ঃ-

শ্রীমান বাপু সাহেব বুটী একবার পেটের অসুখে অসম্ভব ভুগছিলেন। ওঁর আলমারিতে অনেক রকমের ওষুধ ছিল, কিন্তু কোনটাই কার্য্যকরী হচ্ছিল না। বাপু সাহেব দিনে-দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ওঁর অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, মস্‌জিদে এসে বাবার দর্শন করতে পারতেন না। বাবা ওঁকে নিজের কাছে ডেকে বললেন- "সাবধান, আর তোমার পেট খারাপ হবে না।" তারপর আঙ্গুল উঠিয়ে বলেন- "বমিও বন্ধ হয়ে যাবে।" বাবা এমন কৃপা করেন যে, রোগ সমূলে

নষ্ট হয়ে গেল এবং বুটী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

আরেকবার উনি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। ফলতঃ ওঁর খুব তেষ্টা পেত। ডাক্তার পিল্লে ওঁর সব রকমের চিকিৎসা করেন, কিন্তু ওঁর অবস্থায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অবশেষে উনি আবার বাবার কাছে গিয়ে ওঁর রোগ নিবারণ করার জন্য প্রার্থনা করেন। বাবা ওঁকে মিষ্টি দুধে বাদাম, আখরোট ও পিস্তা ফুটিয়ে খেতে বলেন।

অন্য কোন ডাক্তার বা হাকীম, বাবার এই ঔষধিটিকে মারাত্মক মনে করবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে বাবার আদেশ পালন করাতে এই রোগটি সমূলে নষ্ট হয়ে গেল।

আলন্দীর স্বামী ঃ-

আলন্দীর এক স্বামীজী বাবার দর্শনার্থে শিরডী আসেন। ওঁর কানে একটা অসহ্য ব্যথা হত, যার জন্য উনি এক দণ্ডও বিশ্রাম করতে পারতেন না। ওঁর শল্য চিকিৎসাও হয়েছিল - তবুও ওঁনার কানের ব্যাথা কমে নি। শেষে নাজেহাল হয়ে উনি বাবার কাছে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে গেলেন। সেই দেখে শামা বাবার কাছে প্রার্থনা করেন- "স্বামীজীর কানে খুব ব্যথা - আপনি ওঁর উপর কৃপা করুন।" বাবা আশ্বাস দিয়ে বলেন- "আল্লাহ মঙ্গল করবেন।" স্বামীজী পুণায় ফিরে গেলেন এবং এক সপ্তাহ পর শিরডীতে চিঠি পাঠান- "ব্যথা ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু ফোলা ভাবটা এখনো আগের মতই আছে।" সেটা যাতে ঠিক হয়ে যায়, তাই অপারেশনের জন্য উনি বম্বে যান। 'সার্জন' (শল্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ) সব পরীক্ষা করার পর জানান, "অপারেশানের কোন দরকার নেই।" বাবার শব্দের গূঢ়ার্থ আমাদের মত অজ্ঞ, মুর্খ কি করে বুঝবে?

কাকা মহাজনী ঃ-

কাকা মহাজনী নামে বাবার এক ভক্ত একবার অতিসার রোগে ভুগছিলেন। বাবার সেবায় কোন বাধা না পড়ে, এই ভেবে উনি মস্‌জিদের এক কোণে এক ঘটি জল রেখে দেন, যাতে প্রয়োজন হলেই বাইরে যেতে পারেন। যদিও উনি বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি কারণ উনি ভেবেছিলেন উনি শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু শ্রী সাইবাবা তো সবই জানতেন। মস্‌জিদের মেঝে তৈরী করার স্বীকৃতি তো বাবা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও যখন আসল কাজ আরম্ভ হয়, তখন বাবা হঠাৎ রেগে ওঠেন। উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে শুরু করেন। মস্‌জিদে গোলমাল বেঁধে যায় এবং সকলেই পালাতে শুরু করে। যেই কাকা সেখান থেকে পালাতে যাবেন, অমনি বাবা ওঁকে ধরে নিজের সামনে বসিয়ে দেন। এই গোলমালে কেউ একটা চীনেবাদামের ছোট থলে সেখানে ভুলে ফেলে গিয়েছিল। বাবা তার মধ্যে থেকে এক মুঠো চীনেবাদাম বার করে, সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলি কাকাকে দেন। রেগে যাওয়া, চীনেবাদাম ছাড়ানো, সে গুলি কাকাকে খাওয়ানো, এক সাথেই চলছিল। বাবা তার মধ্যে থেকে কয়েকটি চীনেবাদাম নিজেও খান। যখন থলেটি প্রায় খালি হয়ে যায়, তখন বাবা বলেন- "আমার তেষ্টা পাচ্ছে। একটু জল নিয়ে এসো।" কাকা এক ঘড়া জল নিয়ে আসেন এবং দুজনে তার থেকে জল খান। এরপর বাবা বললেন- "এইবার তোমার অতিসার রোগ দূর হয়ে গেছে। তুমি মেঝে তৈরী করার কাজটা ঠিক ভাবে করতে পারবে।" একটু পরই যারা ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা একে-একে ফিরে এলো। কাজ আবার শুরু হয়ে গেল। কাকার রোগও প্রায় সেরে এসেছিল। তাই উনিও পূর্ণ উৎসাহের সাথে কাজে

নেমে পড়েছিলেন। অতিসার রোগের ওষুধ কি চীনেবাদাম হতে পারে? এর উত্তর কে দেবে? বর্তমান চিকিৎসা প্রণালীর হিসেবে চীনেবাদাম খেলে, এই রোগ দূর হওয়ার থেকে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকবারের মত, আসলে বাবার আশ্বাস ও নির্দেশই ওষুধহিসাবে সিদ্ধ হলো।

হরদার দত্তোপন্ত ঃ-

হরদার শ্রী দত্তোপন্ত ১৪ বছর থেকে পেটের কষ্টে ভুগছিলেন। কোন ওষুধেই লাভ হচ্ছিল না। হঠাৎ কোথাও থেকে বাবার কীর্তি ওঁর কানে আসে যে, বাবার দৃষ্টি মাত্রতেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। অতএব উনিও শিরডী এসে বাবার চরণে শরণ নেন। বাবা তাঁর স্বাভাবিক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওঁকে আশীর্বাদ করেন। আশিস ও উদী পেয়ে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ভবিষ্যতে কখনো আর ওর ব্যথা হয়নি। এই রকমের তিনটি চমৎকার এই অধ্যায়ের শেষে লেখা হচ্ছে -

১) মাধবরাও দেশপাণ্ডে অর্শ রোগে ভুগছিলেন। বাবার আদেশ অনুসারে সোনামুখীর পাতার রস খেয়ে নীরোগ হয়ে যান। দুবছর পর আবার সেই কষ্ট দেখা দেওয়াতে উনি বাবার সাথে পরামর্শ না করেই, সেই রস সেবন করেন। ফলস্বরূপ রোগ বেড়ে যায়। কিন্তু পরে বাবার কৃপায় উনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

২) কাকা মহাজনীর বড় ভাই - গঙ্গাধর পাণ্ডের কিছু বছর থেকে সমানেই পেটে একটা ব্যথা হত। বাবার কীর্তি শুনে উনিও শিরডী আসেন এবং আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করেন। বাবা ওর পেট স্পর্শ করে বলেন- "আল্লাহ ভালো করবেন।" এরপর প্রায়

তক্ষুনি, ওর পেটের ব্যথা সেরে যায় এবং উনি সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে যান।

৩) শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের একবার পেটে খুব ব্যথা হয়। উনি দিনরাত ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতন ছট্‌পট্‌ করতেন। ডাক্তাররা অনেক রকমের চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষে উনি বাবার শরণ নেন। বাবা ওঁকে ঘিয়ের সাথে 'বর্ফি' (মিষ্টি) খেতে বলেন। এই ওষুধে, উনি অচিরেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এই সব ঘটনা গুলির মাধ্যমে আমরা একটাই ইঙ্গিত পাই যে, স্থায়ী ভাবে রোগ নির্মূল করার আসল ওষুধ হলো, বাবার মুখনিঃসৃত বাণী ও তাঁর কৃপার প্রভাব।

।। শ্রী সাইনাথার্পণমস্তু। শুভম্‌ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্রাম

অধ্যায় - ১৪

নাদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া, সন্ত মৌলা সাহেব, দক্ষিণা মীমাংসা, গণপত্ রাও বোডস্, শ্রীমতি তর্খড, দক্ষিণা মর্ম।

শ্রী সাইবাবার কথা ও কৃপার দ্বারা কিভাবে অসাধ্য রোগ নির্মূল হয়ে যায়, গত অধ্যায়ে সেটা বর্ণনা করা হয়েছে। এবার বাবা কিভাবে রতনজী ওয়াডিয়াকে অনুগৃহীত করেন এবং তাঁকে পুত্রপ্রাপ্তির আশীর্বাদ দেন - তার বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা হবে।

এই সন্তের জীবনী স্বাভাবিক ভাবেই মধুর। তাঁর অন্যান্য কার্য্যকলাপ, যেমন- খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা ও সহজ-স্বাভাবিক অমৃতোপদেশ একই রকম মধুর। তিনি ছিলেন আনন্দের অবতার। নিজের ভক্তদেরও এই পরমানন্দের রসাস্বাদন করান। তাই ভক্তরা তাঁকে কখনো ভুলতে পারেনি। বিভিন্ন রকমের কর্ম ও কর্তব্যের উপদেশ তিনি ভক্তদের দেন, তাই তারা সত্যের পথ অবলম্বন করতে সক্ষম হয়। বাবা সর্বদা চাইতেন যে, লোকেরা সুখে জীবন যাপন করুক এবং সদৈব সজাগ থেকে নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য, আত্মানুভূতি (ঈশ্বর দর্শন), অবশ্যই প্রাপ্ত করুক। **পূর্ব জন্মের শুভ কর্মের ফলস্বরূপই এই দেহ প্রাপ্ত হয়েছে এবং এর সার্থকতা তখনই সিদ্ধ হবে, যখন এর সাহায্যে আমরা এই জীবনে ভক্তি ও মোক্ষ প্রাপ্ত করতে পারব।** জীবনের শেষ সময় ও জীবন লক্ষ্যর বিষয়ে সততই সাবধান ও সতর্ক থাকা উচিত। যদি তুমি নিত্য শ্রী সাই লীলা শ্রবণ করো, তাহলে সর্বদা তাঁর দর্শন পাবে। দিনরাত

হৃদয় দিয়ে তাঁকেই স্মরণ করো। এইরূপ আচরণ করলে, মনের চঞ্চলতা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে। এর নিরন্তর অভ্যাসের ফলে, চৈতন্যধন থেকে অভিন্নতা লাভ হবে।

নাদেড়ের রতনজী ওয়াডিয়া ঃ-

এবার আমরা এই অধ্যায়ের মূল ঘটনার বর্ণনা শুনব। নাঁদেড়ে (নিজাম রাজ্য) রতনজী-শাপুরজী ওয়াডিয়া নামে এক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী থাকতেন। ব্যবসা করে উনি অনেক ধন উপার্জন করেছিলেন ও বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যদিও বাইরে থেকে দেখে, ওঁকে খুব সুখী ও সন্তুষ্ট মনে হত, কিন্তু আসলে উনি অন্তরে দুঃখী ছিলেন। বিধাতার নিয়ম এমনই বিচিত্র যে, এই সংসারে পূর্ণ রূপে সুখী কেউই নয়। উনি পরোপকারী ও দানী ব্যক্তি ছিলেন এবং গরীব-দুঃখীদের অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করতেন। সবাইকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করতেন। ওঁকে লোকেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করত। কিন্তু দীর্ঘকাল অবধি কোন সন্তান না হওয়ার দরুণ উনি খুবই সন্তপ্ত ছিলেন। যেরূপ প্রেম ও ভক্তিরহিত কীর্তন, বাদ্যযন্ত্ররহিত সঙ্গীত, যজ্ঞোপবীতরহিত ব্রাহ্মণ, ব্যবহারিক জ্ঞানরহিত শিল্পী, পশ্চাতাপরহিত তীর্থযাত্রা ও কন্ঠমালা ছাড়া অলংকার ভালো লাগে না, সেই রকমই, সন্তানরহিত গৃহস্থ বাড়ীও খালি-খালি লাগে। রতনজী সব সময় এই দুশ্চিন্তাতেই ডুবে থাকতেন। উনি মনে-মনে ভাবতেন- "ঈশ্বরের কি আমার উপরে কখনোই দয়া হবে না? আমার কি কখনো কোন সন্তান হবে না?" এই ভেবে উনি প্রায় উদাস হয়ে থাকতেন। খাবারের প্রতিও কোন রুচি ছিল না। সন্তান প্রাপ্তি কখন হবে, এই চিন্তাতেই দিন কাটত। দাসগণু মহারাজের উপর ওঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাই ওঁর সামনে নিজের মনের কথা খুলে বলেন। দাসগণু তখন শ্রী সাইবাবার শরণে

যেতে ও তাঁর কাছে সন্তান প্রাপ্তির প্রার্থনা করার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শটি রতনজীরও মনে ধরে এবং উনি শিরডী অভিমুখে রওনা হবেন স্থির করেন। কিছুদিন পর, উনি শিরডী আসেন ও বাবার দর্শন করে, ওঁর চরণে লুটিয়ে পড়েন। বাবাকে একটা সুন্দর মালা পরান ও অনেক ফুল-ফল অর্পণ করেন। তারপর বাবার কাছে বসে, শ্রদ্ধাপূর্বক ভাবে প্রার্থনা করেন- "অনেক বিপদগ্রস্ত লোক আপনার কাছে আসে এবং আপনি তাদের কষ্ট তক্ষুনি দূর করে দেন। এই কীর্তি শুনেই আমিও অনেক আশা নিয়ে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে এসেছি। দয়া করে আমায় নিরাশ করবেন না।" শ্রী সাইবাবা ওঁর কাছে পাঁচ টাকা দক্ষিণা চান, যেটা উনি নিজেই দিতে চাইছিলেন। কিন্তু বাবা বলেন- "আমি তোমার কাছ থেকে তিন টাকা চৌদ্দ আনা আগেই পেয়ে গেছি, বাকীটাই দাও।" এই কথা শুনে, রতনজী একটু অবাক হয়ে যান। বাবার কথার অভিপ্রায় উনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। উনি মনে-মনে ভাবেন- "এটা তো আমার প্রথম শিরডী যাত্রা। তাই এ তো খুব আশ্চর্য্যের কথা যে, বাবা তিন টাকা চৌদ্দ আনা আগেই আমার কাছ থেকে কি করে পেলেন?" উনি বাবার এই হেঁয়ালিটি বুঝতে পারলেন না। বাবার শ্রীচরণের কাছেই বসে রইলেন ও বাকি দক্ষিণাটি অর্পণ করেন। এরপর উনি নিজের আগমনের কারণ জানিয়ে পুত্র প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। বাবা করুণায় বিগলিত হলেন। তিনি বললেন- "চিন্তা ছেড়ে দাও, তোমার দুর্দিন এবার শেষ হয়ে গেছে।" উদী দিয়ে বাবা নিজের বরদহস্ত ওঁর মাথার উপর রেখে বললেন- "ভগবান তোমার ইচ্ছে পূরণ করবেন।"

বাবার অনুমতি পেয়ে রতনজী নাঁদেড় ফিরে আসেন ও শিরডীর ঘটনাগুলির বৃত্তান্ত দাসগণু মহারাজকে বলেন। রতনজী বলেন- "সব

কাজই ঠিক মত হলো। বাবার শুভ দর্শন, ওঁর আশীর্বাদ ও প্রসাদও পাওয়া হলো, কিন্তু ওখানকার শুধু একটা কথাই বুঝতে পারলাম না। বাবা বললেন- 'আমি তিন টাকা চৌদ্দ আনা পূর্বেই পেয়ে গেছি।' দয়া করে এর মানে বোঝান। এর আগে আমি শিরডী কখনো যাইনি। তবে যে টাকার কথা উনি উল্লেখ করলেন, সেই টাকাটা উনি কি করেই বা পেলেন?" দাসগণুর কাছেও এই প্রশ্নটা একটা ধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ বিষয়ে উনি অনেক দিন চিন্তা করেন। কিছুদিন পর ওঁর মনে পড়ে যে, ক'দিন আগেই রতনজী নিজের বাড়ীতে মৌলা সাহেব নামে এক মুসলমান সন্ন্যাসীকে (সন্ত) আমন্ত্রিত করেছিলেন। (মৌলাসাহেব নাদেড়ের এক প্রসিদ্ধ সন্ত ছিলেন এবং কুলির কাজ করতেন।) রতনজী মৌলা সাহেবের সম্মান ও সৎকার হেতু একটা ছোট্ট জলপানের আয়োজন করেছিলেন এবং ওঁর আতিথেয়তাতে কিছু টাকা খরচ হয়েছিল। দাসগণু রতনজীর কাছে খরচার ফিরিস্তিটা চান। এটা জেনে সবার খুব আশ্চর্য্য লাগে যে, ঠিক তিন টাকা চৌদ্দ আনাই খরচ হয়েছিল - এক পয়সা কমও না, এক পয়সা বেশীও না। বাবার ত্রৈকালজ্ঞতার পরিচয় সবাই পেয়ে যায়। যদিও উনি শিরডীতে বাস করতেন, তবুও শিরডীর বাইরে কি-কি হচ্ছে, তার কোনটাই তাঁর অজানা থাকত না। যথার্থরূপে বাবা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পূর্ণ জ্ঞাতা এবং প্রত্যেক আত্মা ও হৃদয়ের সাথে তাঁর সম্বন্ধ আছে। তা নাহলে মৌলা সাহেবের অতিথি সৎকারে করা খরচের রাশি বাবা কি করে জানতে পারতেন।

রতনজী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হন এবং ওঁর মনে শ্রী সাই চরণের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি জাগে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ওঁর ঘরে পুত্ররত্নের জন্ম হয়, যার দরুণ ওঁর আনন্দের সীমা থাকে না। এমন শোনা যায়

যে, ওঁর বারোটি সন্তান হয়, কিন্তু কেবল চারটি জীবিত থাকে। এই অধ্যায়ের শেষে লেখা আছে যে, বাবা রাওবাহাদুর হরি বিনায়ক শাঠেকে ওঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় বিবাহর পর পুত্ররত্ন প্রাপ্তির ইঙ্গিত করেছিলেন। রাওবাহাদুর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। প্রথমে দুটি মেয়ে হওয়ায় উনি বেশ নিরাশ হন, কিন্তু তৃতীয় বারে পুত্রের জন্ম হয়। এই ভাবে বাবার কথা ফলে যায় এবং শাঠে সাহেব সন্তুষ্ট হন।

দক্ষিণা মীমাংসা ঃ-

দক্ষিণার সম্বন্ধে কিছু অন্য কথা উল্লেখ করে এই অধ্যায়টি শেষ করব। এ তো সবাই জানে যে যারা বাবার দর্শন করতে আসত, তাদের কাছ থেকে বাবা দক্ষিণা নিতেন। এখানে যে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে যে, বাবা যখন ফকির ও উদাসীন ব্যক্তি ছিলেন, তখন ওঁর এই ভাবে দক্ষিণা গ্রহণ করা ও কাঞ্চনকে গুরুত্ব দেওয়া কি উচিত ছিল? এবার আমরা এই প্রশ্নের বিষয়ে বিস্তৃত রূপে আলোচনা করব।

অনেকদিন পর্যন্ত বাবা ভক্তদের কাছ থেকে কিছু নেননি। তিনি পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি নিজের পকেটে জমা করতেন। ভক্ত হোক বা অন্য কেউ - তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নিতেন না। যদি কেউ তাঁর সামনে এক পয়সা রাখত তো তিনি সেটা নিয়ে, তা দিয়ে তামাক বা তেল কিনতেন, তিনি প্রায় কলকি খেতেন। কয়েকজন স্থির করল যে, কিছু না দিয়ে সাধুজনের দর্শন করা উচিত নয়। তাই ওরা বাবার সামনে টাকা রাখতে আরম্ভ করল। যদি এক পয়সা রাখা হতো তো, তিনি সেটা পকেটে রেখে নিতেন। কিন্তু কেউ যদি

দু'পয়সা অর্পণ করত, তাহলে তিনি তক্ষুনি তাকে পয়সা ফেরত দিয়ে দিতেন। শীঘ্রই বাবার নাম ও কীর্তি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাবার দর্শনের জন্য ভক্তদের দল শিরডী আসতে শুরু করে। বাবা তখন তাদের দক্ষিণা স্বীকার করতে শুরু করেন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, স্বর্ণ মুদ্রা অর্পণ না করলে ভগবানের পূজোও অপূর্ণ থেকে যায়। অতএব যখন ঈশ্বর পূজনে মুদ্রার দরকার, তখন সন্ত পূজনেই বা হবে না কেন? শাস্ত্রে বলে যে, ঈশ্বর, রাজা, সন্ত বা গুরুর দর্শন নিজের সামর্থ অনুযায়ী কিছু অর্পণ না করে কখনো করা উচিত নয়। এবার প্রশ্ন ওঠে ওঁদের কি উপহার দেওয়া উচিত? এই সম্বন্ধে উপনিষদে বর্ণিত নিয়মগুলি দেখা যাক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে, একবার দক্ষ প্রজাপতি দেবতা, মানুষ এবং রাক্ষসদের সামনে 'দ' অক্ষর উচ্চারণ করেন। দেবতারা মনে করেন এর অর্থ 'দম' অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা উচিত। মানুষেরা ভাবল তাদের দান করার অভ্যাস অবলম্বন করতে ইঙ্গিত করা হয়েছে ও রাক্ষসেরা ভাবে যে, তাদের 'দয়া' অভ্যাস করতে হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দান ও অন্যান্য সদ্‌গুণের অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। দানের সম্বন্ধে লেখা আছে- "বিশ্বাসের সঙ্গে দান করো।" ভক্তদের কাঞ্চন ত্যাগের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের আসক্তি দূর করার ও চিত্ত শুদ্ধ করানোর জন্য বাবা সবার কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন। কিন্তু ওঁর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বাবা বলতেন- "যা কিছু আমি স্বীকার বা গ্রহণ করি - তার একশো গুণের চেয়েও বেশী আমায় ফেরত দিতে হয়।" তাঁর এই কথার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটা ঘটনা ঃ-

শ্রী গণপতরাও বোডাস্, প্রসিদ্ধ অভিনেতা, নিজের মারাঠী জীবনীতে

লেখেন যে, বাবার বারংবার অনুরোধের ফলে, উনি নিজের টাকার থলিটা বাবার সামনে উল্টে দেন। শ্রী বোডাস্ লিখেছেন যে, এর পরিণাম এই হয় যে, জীবনে কখনো ওঁর আর টাকার অভাব হয়নি এবং প্রচুর অর্থাগম হয়। দক্ষিণার একটা অন্য অর্থও হতে পারে। দু'টো উদাহরণ দিয়ে এই কথাটি স্পষ্ট করা হচ্ছে। বাবা প্রোফেসর সী. কে. নারকের কাছে ১৫ টাকা দক্ষিণা চান। উনি প্রত্যুত্তরে জানান যে, ওঁর কাছে এক পয়সাও নেই। তখন বাবা বলেন- "আমি জানি তোমার কাছে পয়সা নেই, কিন্তু তুমি যোগবশিষ্ঠ অধ্যয়ন তো করো, তার থেকেই দক্ষিণা দাও।" এখানে দক্ষিণার অর্থ হলো - বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে হৃদয়ঙ্গম করা- কারণ হৃদয় তো বাবারই বাসস্থান।

২) দ্বিতীয় ঘটনায় তিনি এক মহিলা, শ্রীমতি আর. এ তর্খডের কাছে ছ টাকা দক্ষিণা চান। মহিলা খুবই দুঃখিত হন কারণ ওঁর কাছে দেওয়ার মত টাকা ছিল না। ওঁর স্বামী তখন ওঁকে বোঝান যে, বাবা ছয় মানসিক রিপুর দিকে ইঙ্গিত করছেন যেগুলি বাবাকেই সমর্পণ করে দেওয়া উচিত। বাবাও এই ব্যাপারে শ্রী তর্খডের সাথে একমত ছিলেন।

এটা মনে রাখতে হবে যে, বাবার কাছে দক্ষিণা রূপে অনেকটা টাকা একত্রিত হয়ে পড়ত। সব কিছু তিনি সেদিনই খরচ করে দিতেন এবং পরের দিন সকাল থেকে আবার ফকির!

প্রায় ১০ বছর অবধি হাজার-হাজার টাকা দক্ষিণা রূপে পাওয়া সত্ত্বেও, যখন বাবা মহাসমাধি গ্রহণ করলেন তখন তার কাছে অল্প টাকাই পড়েছিল। সংক্ষেপে, দক্ষিণা নেওয়ার প্রধান লক্ষ্য তো কেবল ভক্তদের চিত্ত শুদ্ধি বা ভ্রম দূরীকরণই ছিল।

দক্ষিণার মর্ম ঃ-

ঠানের শ্রী বি. ভি. দেব (সেবা-নিবৃত্ত মাম্‌লৎদার, যিনি বাবার পরম ভক্ত ছিলেন) এই বিষয় একটা রচনা প্রকাশিত করেছেন -

"বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে দক্ষিণা নিতেন না। যদি বাবার না চাওয়া সত্ত্বেও, কেউ তাঁকে দক্ষিণা দিত তো, কখনো গ্রহণ করে নিতেন আবার কখনো অস্বীকারও করে দিতেন। তিনি শুধু নির্দ্দিষ্ট ভক্তদের কাছেই কিছু চাইতেন। এমন লোকেদের কাছে তিনি কখনো দক্ষিণা চাইতেন না, যারা ভাবত বাবা চাইলে তবেই দক্ষিণা দেব। যদি কেউ তাঁকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে দক্ষিণা দিত, তাহলে তিনি স্পর্শ করতেন না। বাবা চাওয়া সত্ত্বেও যারা দক্ষিণা দিত না, তিনি তাদের উপর কখনো রাগ করতেন না। যদি কেউ কোন বন্ধু মারফৎ বাবার জন্য দক্ষিণা পাঠাতো এবং সে সেটা দিতে ভুলে যেতো, তাহলে বাবা তাকে কোন-না-কোন ভাবে মনে করিয়ে দিয়ে, সেটি নিয়ে নিতেন। কোন-কোন সময় দক্ষিণার রাশি থেকে কিছু অংশ ফিরিয়ে দিতেন এবং সেটা সামলে বা পূজোর জায়গায় রাখতে বলতেন। ভক্তর তাতে খুব লাভ হতো। যদি কেউ নিজের ইচ্ছের চেয়ে বেশী অর্পণ করতো, তো সেই বাড়তি রাশিটা ফিরিয়ে দিতেন। আবার কারো কারো কাছে তিনি তার ইচ্ছের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষিণা চেয়ে বসতেন, এবং যদি ওর কাছে সেটা না থাকত, তাহলে অন্যদের কাছ থেকে ধার নিতে বলতেন। কারো-কারো কাছে তো, তিনি দিনে তিন চারবার দক্ষিণা চাইতেন।

দক্ষিণার টাকা থেকে বাবা নিজের জন্য খুব অল্প খরচ করতেন - শুধু তামাক ও ধুনির জন্য কাঠ কিনতেন। বাকি সমস্তটাই অন্যান্য

লোকেদের বিভিন্ন ভাগে বিতরণ করে দিতেন। শিরডী সংস্থানের সমস্ত সামগ্রী অবস্থাপন্ন ভক্তরা রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের প্রেরণায় একত্রিত করেছিল। খুব বেশী মূল্যের সামগ্রী যারা আনত, বাবা তাদের উপর খুব রাগ করতেন এবং বকাবকি করতেন। তিনি নানাসাহেব চাঁদোরকরকে বলেন- "আমার সম্পত্তি কেবল একটি কৌপীন ও একটা গেলাস। লোকেরা মিছিমিছি এত দামী জিনিষ এনে আমায় দুঃখ দেয়।" কামিনী ও কাঞ্চন আধ্যাত্মিক পথের দুটি প্রধান বাধা এবং তার জন্য বাবা দুটি 'পাঠশালা' খুলেছিলেন। দক্ষিণা গ্রহণ করে ও রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী পাঠিয়ে, তিনি এইটাই পরীক্ষা করতেন যে তাঁর ভক্তরা এই দুটি আসক্তি হতে মুক্ত হতে পেরেছে কিনা। তাই যখন কেউ আসত, উনি দক্ষিণা চাইতেন ও 'পাঠশালায়' (রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ী) যেতে বলতেন। ওরা এই দুটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, অর্থাৎ এটা সিদ্ধ হলে যে কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি তারা উদাসীন, বাবার কৃপায় ও আশীর্বাদে ওদের আধ্যাত্মিক উন্নতি তরান্বিত হত। শ্রী দেব গীতা ও উপনিষদের ঘটনা উদ্ধৃত করে বলেন যে, কোন তীর্থস্থানে কোন সন্তকে করা দান, দানীর জন্য খুব কল্যাণকারী হয়। শিরডী ও শিরডীর মুখ্য দেবতা শ্রী সাইবাবার চেয়ে পবিত্র আর কি বা কে হতে পারে?

।। শ্রী সাঁইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১৫

নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি, শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা, দুটো টিকটিকি।

পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে অধ্যায় ৬-তে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শিরডীতে রামনবমী উৎসব পালন করা হত। সেটি কি ভাবে আরম্ভ হলো এবং প্রথম বছরেই কীর্তন করার জন্য একজন ভালো হরিদাস পেতে কি-কি অসুবিধে হয়, তারও বর্ণনা সেখানে করা হয়েছে। এই অধ্যায়তে দাসগণুর কীর্তন পদ্ধতি বর্ণনা করা হবে।

নারদীয় কীর্তন পদ্ধতি ঃ-

কীর্তন করার সময় হরিদাসরা একটা লম্বা চাপকান ও পুরো পোশাক পরে। ওরা মাথায় একটা ছোট পাগড়ী বাঁধে ও একটা লম্বা কোট ও ভেতরে কামিজ, কাঁধে উপারনী এবং একটা ধুতি পরে। গ্রামে কীর্তন করতে যাওয়ার সময়, একবার দাসগণু ঐভাবে সেজে-গুজে, বাবাকে প্রণাম করতে পৌঁছন। বাবা ওঁকে দেখে বলেন- "আচ্ছা, বর মশাই! এইভাবে সেজে গুজে কোথায় যাচ্ছো?" উত্তর পেলেন- "কীর্তন করতে।" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন- "কোট, উপারনী ও ফেটা - এই সবের কি দরকার? এগুলো এক্ষুনি আমার সামনে খুলে ফেল। এগুলি পরার কোন দরকার নেই।" এরপর দাসগণু এই বস্ত্রগুলি কখনো পরেননি। উনি সর্বদা কোমর থেকে উপর পর্যন্ত শরীরটা খোলা রেখে হাতে করতাল এবং গলায় মালা পরে, কীর্তন করতেন। এই পদ্ধতিটি যদিও হরিদাস পদ্ধতির অনুরূপ নয়, তবুও সর্বোত্তম ও পবিত্র। কীর্তন পদ্ধতির জন্মদাতা, নারদ মুনি, কোমর

থেকে মাথা পর্যন্ত কোন বস্ত্র ধারণ করতেন না। উনি এক হাতে বীণা নিয়ে হরি কীর্তন করতে-করতে ত্রিলোকে ঘুরতেন।

শ্রী চোলকরের চিনি ছাড়া চা ঃ-

পুণা এবং আহমদনগর জেলায় বাবা সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের ব্যক্তিগত বার্তালাপ এবং দাসগণুর মধুর কীর্তনের মাধ্যমে বাবার কীর্তি বম্বে ও তার আশে-পাশের প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর সমস্ত কৃতিত্ব দাসগণুকেই দেওয়া যেতে পারে। ভগবান যেন ওঁকে সদা সুখী রাখেন। উনি নিজের সুন্দর-সরল কীর্তনের মাধ্যমে বাবাকে বাড়ী-বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন। শ্রোতাদের তো বিভিন্ন রকমের রুচি থাকে। কারো হরিদাসদের বিদ্বতা, কারো ভাব, কারো গান, তো কারো বেদান্ত বিবরনের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। কিন্তু এমন খুব কম লোক দেখা যায়, যাদের সন্তলীলা শ্রবণ করে, মনে প্রেম ও শ্রদ্ধা জেগে ওঠে না। শ্রী দাসগণুর কীর্তন, শ্রোতাদের হৃদয়ে একটা স্থায়ী ছাপ ছেড়ে যেত। এমনি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক সময় ঠানের শ্রী কৌপীনেশ্বর মন্দিরে, শ্রী দাসগণু কীর্তন ও শ্রী সাইবাবার লীলা গুণগান করছিলেন। ঠানে আদালতের চোলকার নামে এক অস্থায়ী কর্মচারী সেই সময় শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এবং দাসগণুর কীর্তন শুনে খুবই প্রভাবিত হন। মনে মনে বাবাকে নমস্কার করে প্রার্থনা করেন- "হে বাবা! আমি একজন গরীব মানুষ এবং নিজের পরিবারের ঠিকমত ভরন-পোষণও করতে পারি না। যদি আমি আপনার কৃপায় বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাই, তাহলে আপনার শ্রীচরণে এসে মিছরি প্রসাদ বিতরণ করব।"

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় ও চোলকর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যান। ওঁর চাকরীটিও স্থায়ী হয়ে যায়। "শুভস্য শীঘ্রম্।" শ্রী চোলকর গরীব তো ছিলেনই, তায় ওর পরিবারও বড় ছিল। অতএব শিরডী যাতায়াতের খরচা জোটাতে যথেষ্টই অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। কথায় বলে- "নাহ্নে ঘাট পার হওয়া যায়, 'সহ্যাদ্রি' পাহাড়ও অতিক্রম করা যায়, কিন্তু গরীব গৃহস্থের পক্ষে ঘরের চৌকাঠ পার হওয়াই শক্ত।" কিন্তু নিজের সংকল্পটাও অতি শীঘ্র পুরো করার জন্য উনি উৎসুক ছিলেন। উনি মিতব্যয়ী হয়ে, নিজের খরচ কমিয়ে, পয়সা বাঁচাবো বলে স্থির করেন। তাই উনি বিনা চিনির চা খাওয়া শুরু করেন এবং এই ভাবে কিছু টাকা জমিয়ে শিরডী পৌঁছান। বাবার দর্শন করে তাঁর শ্রীচরণে একটা নারকেল অর্পণ করেন। নিজের সংকল্পানুসারে শ্রদ্ধা সহকারে মিছরি বিতরণ করেন। বাবাকে বলেন যে "আপনার দর্শন পেয়ে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত ইচ্ছে আপনার কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সেদিনই পুরো হয়ে গিয়েছিল।" মস্‌জিদে শ্রী চোলকরের আতিথেয়তার দায়িত্ব যার উপর দেওয়া হয়েছিল, তিনিও (শ্রী বাপুসাহেব যোগ) সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। ওঁরা দুজন প্রস্থান করার জন্য উঠে দাঁড়াতেই বাবা যোগকে বলেন- "নিজের অতিথির চায়ে ভালোভাবে চিনি মিশিয়ে দিও।" এই অর্থপূর্ণ শব্দগুলি শুনে শ্রী চোলকরের হৃদয় বিগলিত হয়ে ওঠে এবং ওঁর খুবই আশ্চর্য্য লাগে। ওঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে থাকে এবং উনি প্রেমেবিহ্বল হয়ে বাবার চরণে লুটিয়ে পড়েন। এদিকে বাবার এই অদ্ভুত আদেশ- "বেশী চিনি দিয়ে অতিথিকে চা দাও" শুনে যোগেরও কৌতূহল হচ্ছিল যে, এর অর্থ কি হতে পারে? বাবা শ্রী চোলকরকে সংকেত দেন যে, তিনি ওঁর চিনি ছাড়ার প্রতিজ্ঞার কথা ভালভাবেই জানতেন।

বাবা সব সময় এই কথাই বলতেন- **"যদি তুমি শ্রদ্ধাসহ আমার দিকে হাত বাড়াও তাহলে আমি সর্বদাই তোমার সাথে থাকব।** যদিও আমি শারীরিক রূপে এখানে বিদ্যমান, তবুও সাত সমুদ্র পারেও যা ঘটে, সে সবই আমি জানি। আমি তোমার হৃদয়ে বিরাজমান, তোমার অন্তরেই আছি। যাঁর তোমার ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের হৃদয়ে বাস, তাঁরই পূজো করো। সে-ই সৌভাগ্যশালী, যে আমার সর্বব্যাপী স্বরূপের সাথে পরিচিত।" বাবা শ্রী চোলকরকে কত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিলেন।

দুটো টিকটিকির মিলন ঃ-

এবার আমরা দুটি, টিকটিকির কাহিনী দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করব। একবার বাবা যখন মস্‌জিদে বসেছিলেন, সেই সময় একটা টিকটিকি টিক্-টিক্ আওয়াজ করতে শুরু করে। একজন কৌতূহলী ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "টিকটিকির আওয়াজের কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? এটা শুভ না অশুভ?" বাবা উত্তর দেন- "এই টিকটিকির বোন আজ ঔরঙ্গাবাদ থেকে, এখানে আসবে। তাই এ খুশীতে নেচে বেড়াচ্ছে।" ভক্তটি বাবার কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তাই সে চুপ করে সেখানেই বসে থাকে।

এমন সময় ঔরঙ্গাবাদ থেকে একটি লোক ঘোড়ায় চেপে বাবার দর্শন করতে আসে। লোকটি তো আরেকটু এগিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু ঘোড়া ক্ষিধের চোটে আর এগোয় না। তখন সে ছোলা আনার জন্য একটা থলে বার করে, ধূলো ঝাড়বার জন্য সেটা যেই মাটিতে ঝাড়ে, অমনি একটা টিকটিকি বেরিয়ে সবার সামনেই সোজা দেওয়াল বেয়ে উঠে যায়। যে ভক্তটি প্রশ্ন করেছিল, বাবা তাকে

ব্যপারটি মন দিয়ে দেখতে বলেন। টিকটিকিটি ইতিমধ্যেই তার বোনের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। দুই বোন অনেকক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। কোথায় শিরডী আর কোথায় ঔরঙ্গাবাদ? কি ভাবে একটা লোক ঘোড়ায় চেপে থলেতে টিকটিকি নিয়ে সেখানে আসে এবং বাবা তাদের সাক্ষাতের কথা কিভাবে আগে থেকেই জানতে পারেন - এই সব ঘটনাগুলি খুবই আশ্চর্য্যজনক ও বাবার সর্বব্যাপকতার উদাহরণস্বরূপ।

শিক্ষা ঃ-

যে এই অধ্যায়টি মন দিয়ে পড়বে ও মনন করবে, সাঁই কৃপায় তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে এবং সে পূর্ণরূপে সুখী হয়ে শান্তি প্রাপ্ত করবে।

।। শ্রী সাঁইনাথার্পণমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১৬-১৭

শীঘ্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি, তার জন্য যোগ্যতা, বাবার উপদেশ, বাবার বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব চর্চিত বিষয় ঃ-

শ্রী চোলকরের সংকল্প কিভাবে পূর্ণ রূপে ফলসিদ্ধ হয়, সেটা গত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ কাহিনীতে শ্রী সাইবাবা এই ইঙ্গিত করেন যে, যদি প্রেম ও ভক্তি সহকারে তুচ্ছ বস্তুও অর্পণ করা হয়, তাহলেও তিনি সেটা সানন্দে স্বীকার করে নেন। কিন্তু যদি ঐ একই বস্তু উদ্ধত ভাবে অর্পণ করা হত, তাহলে সেটা অস্বীকৃত হয়ে যেত। পূর্ণ সচ্চিদানন্দ হওয়ার দরুণ তিনি বাহ্য আচার-বিচারকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না এবং বিনম্র হয়ে ও শ্রদ্ধাপূর্বক দেওয়া জিনিষ ভালবেসে গ্রহণ করতেন।

সদ্‌গুরু শ্রী সাইবাবার চেয়ে বেশী দয়ালু ও হিতৈষী, এই সংসারে আর কে হতে পারে? সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করে যে সেই চিন্তামণি বা কামধেনুর সঙ্গেও তাঁর তুলনা হতে পারে না। যে অমূল্য ধনের উপলব্ধি সদ্-গুরুরদ্বারা হতে পারে, সেটা আমাদের কল্পনারও অতীত।

এক বড়লোককে, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির ইচ্ছে নিয়ে বাবার কাছে আসেন, বাবা কি উপদেশ দেন, এবার সেই কথা শুনুন। একজন ধনী ব্যক্তির (দুভার্গ্যবশতঃ তার নাম মূল গ্রন্থে দেওয়া নেই) কাছে প্রচুর ধনদৌলত, ঘোড়া, জমি ও অনেক দাস-দাসী ছিল। বাবার কীর্তি তার কানে যেতেই সে নিজের এক বন্ধুকে বলে- "আমার আর কোন বস্তুর ইচ্ছে বা অভিলাষ বাকী নেই। তাই এবার শিরডী গিয়ে বাবার

কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা উচিত। আর যদি কোন রূপে সেটা সম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমার চেয়ে সুখী আর কে হবে?" ওঁর বন্ধু ওঁকে বোঝায়- "ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত করা এত সহজ নয়, বিশেষ করে তোমার মত মোহগ্রস্ত লোকের পক্ষে, যে সর্বদা স্ত্রী, সন্তান ও দ্রব্য উপার্জনের চক্রে জড়িয়ে থাকে। তুমি ভুলেও কাউকে এক পয়সা দান করো না - তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের আকাঙ্খা কে পুরো করতে পারে?" কিন্তু সেই ধনী ব্যক্তি, বন্ধুর কথা উপেক্ষা করে, একটা টাঙ্গায় চড়ে শিরডী আসে এবং সোজা মস্‌জিদে এসে পৌঁছায়। শ্রী বাবার দর্শন করে তাঁর চরণে বসে প্রার্থনা করে- "এখানে আসা ভক্তদের আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়ে দেন। একথা শুনে আমি অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি ও বেশ ক্লান্তও হয়ে গেছি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান পেয়ে গেলে, আমার কষ্ট সফল ও সার্থক হয়ে যাবে।"

বাবা বলেন- "প্রিয় বন্ধু! একটু সবুর কর। আমি খুব শীঘ্রই তোমায় ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দেব। আমার সব কাজ নগদেই হয়, আমি ঋণ রাখি না। তাই অনেকেই ধন, স্বাস্থ্য, মান, উচ্চপদ ও অন্যান্য পদার্থের ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার কাছে আসে। বৈষয়িক জিনিষের ইচ্ছে নিয়ে আসা লোকের এখানে অভাব নেই, কিন্তু আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসুদের আগমন খুবই দুর্লভ। আমার জন্য এই মুহূর্তটি খুবই শুভ। তোমার মত মহানুভব আমায় ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করার জন্য জোর দিচ্ছে। আমি খুশী হয়ে তোমাকে ব্রহ্মদর্শন করিয়ে দেব।"

এই বলে বাবা ওকে নিজের কাছে বসিয়ে, এদিক-ওদিকের কথা বলতে শুরু করেন। ফলতঃ ও খাণিকক্ষনের জন্য নিজের প্রশ্নের কথা ভুলে যায়। বাবা এবার একটা ছেলেকে ডেকে, নন্দু মারোয়াড়ীর

কাছে পাঁচ টাকা ধার করে আনতে পাঠান। ছেলেটি ফিরে এসে জানায় যে, নন্দুর তো কোন হদিস নেই এবং ওর বাড়ীতে তালা ঝুলছে। এবার বাবা ওকে আরেকটি দোকানদারের কাছে পাঠান। কিন্তু এবারও ছেলেটি টাকা আনতে ব্যর্থই হয়। এই রকম ভাবে তিন-চার বার চেষ্টা করেও, টাকার জোগাড় হতে পারল না।

আমরা একথা খুব ভালো ভাবে জানি যে, বাবা স্বয়ং সগুণ ব্রহ্মের অবতার ছিলেন। তাই এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পাঁচ টাকার মত তুচ্ছ রাশির তাঁর প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাঁর তো এই টাকার কোন প্রয়োজনই হওয়ার কথা নয়। এই নাটকটি তিনি কেবল আগন্তুকের পরীক্ষার্থে রচনা করেছিলেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু মহাশয়ের কাছে নোটের বান্ডিল ছিল। সে যদি সত্য সত্যই ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত করার জন্য উৎসুক হতো, তাহলে এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকত না। বাবা যখন হন্নে হয়ে টাকা ধার করার জন্য ছেলেটিকে এখানে-ওখানে ছোটাচ্ছিলেন, তখন সে শুধুমাত্র দর্শক হয়ে বসে থাকত না। মহাশয় ভালভাবেই জানতেন যে, বাবা নিজের কথা অনুযায়ী, ঋণ অবশ্যই শোধ করে দেবেন। যদিও বাবার চাওয়া রাশি খুবই অল্প ছিল, তবুও সে নিজে থেকে পাঁচ টাকা ধার দিতে সাহস করে উঠতে পারে নি। পাঠকগণ! একটু ভেবে দেখুন, এই ধরনের ব্যক্তি বাবার কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের (যেটা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বস্তু) প্রাপ্তির জন্য উপস্থিত হয়। বাবাকে যে সত্যি-সত্যি ভালবাসে, এমন ভক্ত শুধুমাত্র দর্শক না হয়ে, তক্ষুনি পাঁচ টাকা দিয়ে দিত। কিন্তু এই মহাশয়ের মনোবৃত্তি তো একেবারেই ভিন্ন। সে টাকাও দেয় না, আর শান্ত হয়ে অপেক্ষা করতেও রাজী ছিল না। বরং তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টায় বাবাকে অধীর হয়ে বলে- "বাবা! দয়া করে তাড়াতাড়ি আমায়

ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করুন।" বাবা উত্তর দেন- "ওহে! এই নাটকটি তো তোমার জন্যই ছিল। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারলে না? আমি তো তোমায় ব্রহ্মদর্শণ করাতেই চেষ্টা করছিলাম। শোন তবে, সংক্ষেপে এর তাৎপর্য্য বলি। ব্রহ্ম দর্শন প্রাপ্ত করার জন্য পাঁচটি বস্তু ত্যাগ করতে হয় - যথা **১) পাঁচ প্রাণ ২) পাঁচটি ইন্দ্রিয় ৩) মন ৪) বুদ্ধি ও ৫) অহংকার। এই হলো ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মানুভূতির পথ, তলোয়ারের ধারে চলার ন্যায় কঠিন।**

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানুভূতির যোগ্যতা ঃ-

অধিকাংশ মানুষের নিজের জীবনকালে ব্রহ্মদর্শন হয় না। তার প্রাপ্তির জন্য কিছু যোগ্যতা থাকাও নিতান্ত আবশ্যক।

১) মুমুক্ষুত্ব (মুক্তির তীব্র উৎকণ্ঠা)

যদি কেউ মনে করে যে, আমি বন্ধনে আছি এবং এই বন্ধন হতে মুক্তি চাই তাহলে তার নিজের লক্ষ্যের প্রাপ্তির জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করতে থাকা উচিত। প্রত্যেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন লোকই আধ্যাত্মিক পথে চলার যোগ্য।

২) বিরক্তি

ইহলোক-পরলোকের সমস্ত পদার্থের প্রতি উদাসীনতার ভাব। ঐহ্যিক বস্তুর লাভ এবং প্রতিষ্ঠা-যতক্ষণ এদের প্রতি বৈরাগ্য উৎপন্ন না হয়, ততক্ষন কেউ আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার অধিকারী হতে পারে না।

৩) অন্তর্মুখীতা

ঈশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির রচনা এমন ভাবে করেছেন যে, ওদের স্বাভাবিক বৃত্তি সর্বদা ওদের বাইরের দিকে আকৃষ্ট করে। আমরা সর্বদাই বাইরের জগতের ধ্যান করি। যারা আত্মদর্শন ও দিব্য জীবনের প্রতি ইচ্ছুক, তাদের নিজেদের দৃষ্টি অন্তর মুখী করে, আত্মলীন হয়ে থাকা উচিত।

৪) পাপ শুদ্ধি

যতক্ষন না মানুষ দুষ্টতা ত্যাগ করে, দুষ্কর্ম না ছাড়ে, ততক্ষণ সে পূর্ণ শান্তি পায় না আর তার মনও স্থির হয় না। শুধুমাত্র বুদ্ধির জোরে জ্ঞানলাভ কখনোই হতে পারে না।

৫) সঠিক আচরণ

যতক্ষন মানুষ সত্যবাদী, ত্যাগী ও অন্তর্মুখী হয়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে জীবনযাপন করে না, ততক্ষন তার আত্মোপলব্ধি সম্ভব নয়।

৬) সারবস্তু গ্রহণ করা

দুরকমের বস্তু হয় - নিত্য এবং অনিত্য। প্রথমটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধীয় ও দ্বিতীয়টি সাংসারিক সম্বন্ধীয়। মানুষকে এই দুটিরই সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কোন একটিকে বেছে নিতে হয়। বিদ্বান পুরুষ অনিত্য থেকে নিত্য বস্তুকেই শ্রেয় বলে মনে করেন। কিন্তু মূঢ়মতি জন আসক্তিতে পড়ে অনিত্যকেই শ্রেষ্ঠ জেনে, তদোনুরূপ আচরণ করে।

৭) মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ

শরীর একটা রথ। আত্মা তার স্বামী ও সারথি। মন তার লাগাম এবং ইন্দ্রিয়গুলি তার ঘোড়া। ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণই তার পথ। যারা মন্দবুদ্ধি ও যাদের মন চঞ্চল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি রথের দুষ্টু ঘোড়ার মত, তারা নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে না এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকে। কিন্তু যারা বিবেকশীল, নিজেদের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে এবং যাদের ইন্দ্রিয় সারথির উত্তম ঘোড়ার মত নিয়ন্ত্রণে থাকে, তারাই গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারে অর্থাৎ তারা পরমপদ প্রাপ্ত করে এবং তাদের আর পুণর্জন্ম হয় না। যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির সাহায্যে মনকে বশ করে নেয়, সে শেষে নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করে, সেই সর্বশক্তিমান ভগবান বিষ্ণুর ধামে পৌঁছে যায়।

৮) মনের পবিত্রতা

যতক্ষন নিষ্কাম কর্ম না করা হয়, ততক্ষন মনের শুদ্ধি এবং আত্মদর্শন সম্ভব হয় না। বিশুদ্ধ মনেই বিবেক ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, যার দ্বারা আত্ম দর্শনের পথে উন্নতি সম্ভব। অহংকারশূণ্য না হয়ে তৃষ্ণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়-বাসনা আত্মানুভূতির পথে বিশেষ বাধক। এই ধারণা যে আমি একটি শরীর - ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তুমি নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করতে চাও, তাহলে এই ধারণা এবং আসক্তি ত্যাগ করো।

৯) গুরুর প্রয়োজনীয়তা

আত্মজ্ঞান এত গূঢ় ও রহস্যময় যে শুধুমাত্র নিজ চেষ্টায় তার প্রাপ্তি সম্ভব নয়। তাই গুরুর (যাঁর আত্মানুভূতি প্রাপ্ত হয়ে গেছে) সাহায্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট করেও যা

অন্য লোকেরা দিতে পারে না, সেটা এমন গুরুর কৃপায় সহজেই প্রাপ্ত হয়ে যায়। যিনি স্বয়ং সেই পথ অনুসরণ করে এসেছেন, তিনিই নিজের শিষ্যকে খুব সহজেই আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুভূতি প্রদান করে দেন। (তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।। -গীতা **৪।। ৩৪)**

১০) অবশেষে ঈশ্বর-কৃপা পরমাবশ্যক

ভগবান যখন কারো উপর কৃপা করেন, তখন তাকে বিবেক ও বৈরাগ্য প্রদান করে এই ভবসাগর পার করিয়ে দেন। এরকম আত্মানুভূতি, নানা প্রকারের বিদ্যা-বুদ্ধি বা শুষ্ক বেদাধ্যয়ণ দ্বারা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। এটি তো যাঁকে এই আত্মা বরণ করে, সে-ই প্রাপ্ত করতে পারে এবং তার সামনেই আত্মা নিজের স্বরূপ প্রকট করে - কঠোপনিষদে এই কথাই লেখা আছে।

বাবার উপদেশ ঃ-

বাবার এই উপদেশ যখন শেষ হল তখন বাবা ঐ বড়লোককে বললেন- "আচ্ছা মহাশয়! আপনার পকেটে পাঁচ টাকার পঞ্চাশ গুণ (টাকার রূপে) ব্রহ্ম আছে, সেটিকে দয়া করে বাইরে বার করুন।" উনি টাকাগুলি বার করেন এবং সবার দেখে খুব আশ্চর্য্য লাগে যে মোট দশ-দশ টাকার পঁচিশটা নোট ছিল। বাবার সর্বজ্ঞতা দেখে, ভদ্রলোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান এবং বাবার পায়ে পড়ে আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করেন। তখন বাবা বলেন- "নিজের ব্রহ্মের (নোটের) বোঁচকা গুটিয়ে নাও। যতক্ষন তুমি ঈর্ষা ও লোভ থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হবে না, ততক্ষন ব্রহ্মের সত্য স্বরূপকে জানতে পারবে না। যার মন ধন, সন্তান ও ঐশ্বর্য্যেই পড়ে থাকে, সে এই আসক্তিগুলি ত্যাগ

না করে ব্রহ্মকে জানবার কি করে আশা করতে পারে? আসক্তির ভ্রম ও ধন তৃষ্ণা দুঃখের এক ঘূর্ণি। তাতে অহংকার ও ঈর্ষারূপী কুমীরেরা কিলবিল করে। শুধু ইচ্ছামুক্ত মানুষই ভবসাগর পার করতে পারে। তৃষ্ণা ও ব্রহ্মের এই রকমই সম্বন্ধ এবং এই দুটি পারস্পরিক শত্রু।

তুলসীদাস বলেছেন -

যেথায় রাম সেথায় নাই কাম, যেথায় কাম সেথায় নাই রাম।
তুলসী, কভু হয় নাই রবি-রজনী এক ধাম।।

যেখানে লোভ, সেখানে ব্রহ্মের ধ্যান বা চিন্তনের কোন অবকাশ থাকে না। তবে লোভী পুরুষ বৈরাগ্য ও মোক্ষ কি ভাবে প্রাপ্ত করতে পারে? সে কখনো শান্তি ও সন্তোষ পায় না। আর সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞও হতে পারে না। যদি এক কণা লোভও মনে থেকে যায়, তাহলে বোঝা উচিত যে, সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদি একজন উত্তম সাধক ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছে বা নিজের কর্তব্যের প্রতিফল পাওয়ার মনোভাব দূর না করতে পারে এবং যদি তাদের প্রতি ওর মনে অরুচি উৎপন্ন না হয় - তাহলে সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। সে আত্মানুভূতি প্রাপ্ত করতে সফল হয় না। যারা অহংকারী এবং সর্বদা বিষয়-চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাদের উপর গুরুর উপদেশ বা শিক্ষার কোন প্রভাব পড়ে না। অতএব মনের পবিত্রতা অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ এর অভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার কোন গুরুত্ব নেই। সেটা শুধু দম্ভ মাত্র। অতএব যে পথটা সরল ভাবে বুঝতে পারা যায়, সেটাই অবলম্বন করা হোক। আমার ভরা ভাণ্ডার এবং আমি প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণ করতে পারি। কিন্তু পাত্রের যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথাও, আমায় চিন্তা করতে হয়। আমার কথা যদি তুমি মন দিয়ে শোন, তাহলে তোমার নিশ্চয়ই

লাভ হবে। এই মস্‌জিদে বসে আমি কখনো অসত্য উচ্চারণ করি না।" বাড়ীতে কোন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হলে তার সাথে তার পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনকেও ভোজনের জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। ধনী মহাশয়কে দেওয়া বাবার এই জ্ঞানভোজে মস্‌জিদে উপস্থিত সবাই সম্মিলিত হয়। বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে, ঐ মহাশয় ও অন্যান্য সবাই নিজের-নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

বাবার বৈশিষ্ট্য ঃ–

এমন অনেক সাধু-সন্ত আছেন, যাঁরা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে জঙ্গলে পর্ণকুটীরে বা গুহায় একান্তে বাস করে নিজের মুক্তির বা মোক্ষপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেন। তাঁরা অন্যের জন্য চিন্তা না করে, সর্বদা ধ্যানস্থ থাকেন। শ্রী সাইবাবা কিন্তু এই প্রকৃতির ছিলেন না। যদিও তাঁর কোন ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান, নিকট বা দূরের সম্বন্ধী বলে কেউ ছিল না, তবুও তিনি সমাজেই বাস করতেন। তিনি শুধু চার-পাঁচটা বাড়ী থেকে ভিক্ষে করে, সর্বদা নিম গাছের নীচে বসে থাকতেন। সাংসারিক কাজ করে যেতেন এবং লোকেদের শিক্ষা দিতেন, সংসারে থেকে তাদের কিরকম ব্যবহার করা উচিত। এই ধরনের সাধু বা সন্ত খুবই কম দেখা যায়, যাঁরা ভগবদ্দর্শনের পর লোকেদের কল্যাণার্থে সচেষ্ট হন। শ্রী সাইবাবা তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তাই হেমাডপন্ত বলেছেন ঃ-

"সেই দেশ ধন্য, সেই পরিবার ধন্য এবং সেই মাতা-পিতা ধন্য, যেখানে সাইবাবার রূপে এই অসাধারণ, পরম শ্রেষ্ঠ, অমূল্য রত্ন জন্ম গ্রহণ করে।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

অধ্যায় - ১৮-১৯

শ্রী হেমাডপন্তের উপর বাবার কৃপা কিভাবে হয়, শ্রী সাঠে ও শ্রীমতি দেশমুখের গল্প, উত্তম বিচারকে উৎসাহ প্রদান, উপদেশে নবীনতা, নিন্দে সম্বন্ধীয় উপদেশ ও পরিশ্রমের জন্য মজুরী।

ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য লালায়িত এক ধনী ব্যক্তির সাথে বাবা কিরূপ ব্যবহার করেন, তার বর্ণনা হেমাডপন্ত গত দুই অধ্যায়ে দিয়েছেন। এবার হেমাডপন্তের উপর বাবা কিরূপ অনুগ্রহ করেন, উত্তম বিচারকে উৎসাহ দিয়ে সেগুলি ফলীভূত করেন এবং আত্মোন্নতি ও পরিশ্রমের প্রতিফলের সম্বন্ধে কিরূপ উপদেশ দেন - সেই সব কথাই এই দুটি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

পূর্ব বিষয় ঃ-

এ কথা তো সবাই জানে যে, সদ্‌গুরু সব সময় নিজের শিষ্যের যোগ্যতার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। তিনি উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে আত্মানুভূতির দিকে শিষ্যদের এগিয়ে দেন, যাতে ওদের মন একটুও দোলাচলে না থাকে। এই বিষয়ে কিছু লোকের এই রকম মতও শোনা যায় যে, যে শিক্ষা বা উপদেশ সদ্‌গুরুর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয় সেটা অন্যদের মাঝে প্রচার করা উচিত নয়। ওদের এই ধারণা যে, সেটি প্রকাশ করলে তার গুরুত্ব কম হয়ে যায়। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ। সদ্‌গুরু বর্ষা ঋতুর মেঘের মত সর্বত্র একরকম বর্ষণ করেন, অর্থাৎ তিনি নিজের অমৃততুল্য উপদেশ বিস্তৃত ক্ষেত্রে

প্রসারিত করেন। প্রথমে ওর সারতত্ত্ব গ্রহণ করা উচিত, তারপর সংকীর্ণতা ত্যাগ করে, অন্য লোকেদের মাঝেও সেটা প্রচার করা উচিত। এই নিয়ম জাগ্রত ও স্বপ্নে-দুই অবস্থাতেই প্রাপ্ত উপদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ - বুদ্ধকৌশিক ঋষি স্বপ্নে প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ 'রাম রক্ষা স্তোত্র', সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য প্রকট করে দেন। এক দয়াময়ী মা প্রয়োজনে যেরূপ ছেলেকে তেঁতো ওষুধ জোর করে খাওয়ান, সেই রকমই শ্রী সাইবাবাও নিজের ভক্তদের কল্যাণের জন্য উপদেশ দিতেন। তিনি নিজের পদ্ধতি গুপ্ত না রেখে, সম্পূর্ণ স্পষ্টতাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। তাই যে ভক্তরা তাঁর উপদেশগুলি পূর্ণ রূপে পালন করত, তারা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করতে সফল হয়েছে। **শ্রী সাইবাবার ন্যায় সদ্‌গুরুই জ্ঞানচক্ষু খুলিয়ে আত্মার দিব্যতা অনুভব করিয়ে দিতে সর্বসমর্থ।** বিষয়-বাসনার প্রতি আসক্তি নষ্ট করে, তিনি ভক্তদের ইচ্ছেগুলি পূরণ করেন যার ফলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় ও জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকে। এই সব শুধু তখনই সম্ভব, যখন আমরা সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে, তাঁর সেবা করার পর, তাঁর প্রেম অর্জন করতে পারি। তখন ভক্তকামকল্পতরু ভগবানও আমাদের সাহায্য করেন। তিনি আমাদের কষ্ট ও দুঃখ হতে মুক্ত করে, সুখী করেন। এই রকম উন্নতি কেবল সদ্‌গুরুর কৃপার দ্বারাই সম্ভব, যিনি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতীক। তাই আমাদের সব সময় সদ্‌গুরুরই খোঁজ করা উচিত। এবার আমরা মুখ্য বিষয়ের দিকে আসি।

শ্রী সাঠে ঃ-

অনেক বছর আগে ক্রফর্ডের শাসন কালে শ্রী সাঠে নামে এক ভদ্রলোক কিছু সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু এই শাসন বম্বের

লর্ড রে দমন করে দেন। শ্রী সাঠের ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় ওঁর বেশ ধাক্কা লাগে। উনি অত্যন্ত দুঃখী ও নিরাশ হয়ে পড়েন ও ওনার মনে বাড়ী ছেড়ে একান্তে কোন স্থানে বাস করার ইচ্ছে জাগে। বেশীর ভাগ সময় মানুষ বিপদে এবং দুর্দিনেই ঈশ্বরকে স্মরণ করে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসও এই সময়ই বাড়ে। আমরা কষ্ট দূর করার জন্য তাঁর কাছেই প্রার্থনা করি। যদি আমাদের পাপ কর্ম অবশিষ্ট না থাকে, তাহলে ঈশ্বরও আমাদের সাক্ষাৎ কোন সন্তপুরুষের সাথে করিয়ে দেন, যিনি আমাদের কল্যাণার্থে সঠিক পথ দেখান। ঠিক এমনই শ্রী সাঠের জীবনেও ঘটে। ওঁর এক বন্ধু ওঁকে শিরডী যাওয়ার পরামর্শ দেন। মনের শান্তি এবং ইচ্ছাপূর্তির জন্য সেখানে দেশের দূর-দূরান্ত থেকে লোকের দল আসত ও আজও আসে। শ্রী সাঠের এই পরামর্শটি খুবই ভালো লাগে এবং **১৯১৭** সালে উনি শিরডী যান। বাবার সনাতন, পূর্ণব্রহ্ম, স্বয়ং দীপ্তিমান, নির্মল ও বিশুদ্ধ স্বরূপ দর্শন করে, ওঁর মনের সমস্ত উদ্বেগ নষ্ট হয়ে, চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়ে যায়। উনি ভাবেন- "গত জন্মের সঞ্চিত শুভ কর্মের ফলেই আজ আমি শ্রী সাইবাবার পবিত্র চরণে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি।" শ্রী সাঠে ছিলেন দৃঢ়চিত্ত পুরুষ। তাই উনি শীঘ্রই 'গুরু চরিত্র'-র অধ্যয়ণ শুরু করে দেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই যখন 'চরিত্র'-র প্রথম অধ্যয়ণ শেষ হয়ে যায়, তখন বাবা সেই রাতেই ওঁকে একটি স্বপ্ন দেন। স্বপ্নটি এইরূপ ছিল -

বাবা নিজের হাতে 'চরিত্র'-টি ধরে আছেন ও শ্রী সাঠেকে কোন একটি বিষয় বোঝাচ্ছেন। শ্রী সাঠে সামনে বসে মন দিয়ে শুনছেন। ঘুম ভাঙ্গতেই স্বপ্নের কথা মনে করে ওঁর খুব আনন্দ হয়। উনি স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, এ তো বাবার পরম কৃপা যে, এইরূপ অচেতন

অবস্থায় পড়ে থাকা প্রাণীদের জাগিয়ে তাদের গুরু চরিত্রর অমৃত পান করার সৌভাগ্য প্রদান করেন। উনি এই স্বপ্নটির কথা কাকা সাহেব দীক্ষিতকেও বলেন। তাঁকে শ্রী সাইবাবাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন- "এর অর্থ কি - এক সপ্তাহের পাঠ কি পর্য্যাপ্ত, না আবার আরেকটি পাঠ শুরু করা উচিত?" শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত উচিত সুযোগ দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন- "হে দেব! এই দৃষ্টান্তটির মাধ্যমে আপনি শ্রী সাঠেকে কি উপদেশ দিতে চাইছেন? উনি কি পাঠ বন্ধ করবেন, নাকি চালিয়ে যাবেন? উনি এক সরল হৃদয়ের ভক্ত। তাই আপনি ওঁর মনোস্কামনা পূরণ করুন। হে দেব! কৃপা করে ওঁকে এই স্বপ্নের যথার্থ অর্থ বুঝিয়ে দিন।" তখন বাবা বলেন- "ওঁর গুরুচরিত্র আরেক সপ্তাহ পড়া উচিত। যদি উনি মন দিয়ে পাঠ করেন, তাহলে ওঁর মন শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং শীঘ্রই ওঁর কল্যাণ হবে। ঈশ্বরও প্রসন্ন হয়ে ওঁকে এই সংসারের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে দেবেন।" এই সময় শ্রী হেমাডপন্তও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বাবার চরণ সেবা করছিলেন। বাবার কথা শুনে ওঁর মনে হয় যে 'সাঠে কেবল এক সপ্তাহের পাঠেই মনোবাঞ্ছিত ফল পেয়ে গেলেন, আর আমি গত চল্লিশ বছর ধরে 'গুরু চরিত্র' পাঠ করছি, যার পরিণাম আজ পর্যন্ত পেলাম না। ওঁর কেবল সাত দিনের শিরডী অবস্থান সফল হয়ে গেল আর আমার গত সাত বছরের **(১৯১০-১৭)** বাস কি ব্যর্থ হয়ে গেল? চাতক পাখীর মত আমি সর্বদা ঐ কৃপা ঘন মেঘের (বাবা) পথ চেয়ে বসে থাকি, যে কখন তিনি আমার উপর অমৃত বর্ষণ করবেন। তিনি কখন আমায় উপদেশ দিয়ে কৃতার্থ করবেন?' এই কথা ওঁর মনে উঠতে না উঠতেই বাবা সেগুলি তক্ষুনি জেনে যান। এরকম অনেক ভক্তরাই অনুভব করেছে যে তাদের মনের সমস্ত গতিবিধি জেনে বাবা তক্ষুনি কুবিচার দমন করে, উত্তম

বিচারগুলিকে উৎসাহিত করতেন। হেমাডপন্তের এই রকম মনোভাব দেখে, বাবা তক্ষুণি তাঁকে শামার কাছে গিয়ে তার সাথে কিছুক্ষণ গল্পগুজোব করতে ও তার কাছ থেকে পনেরো টাকা দক্ষিণা আনতে আদেশ দেন। তাঁর কথা অবজ্ঞা করে, এমন সাহস কার থাকতে পারে? শ্রী হেমাডপন্ত অবিলম্বে শামার বাড়ী গিয়ে পৌঁছন। সেই সময় শামা স্নান করে ধুতি পরছিলেন। উনি বেরিয়ে এসে হেমাডপন্তকে জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি এখানে কি করে? মনে হচ্ছে আপনি মস্‌জিদ থেকে আসছেন। এত উদাস কেন? আপনি একলা কেন? আসুন, বসুন এবং একটু বিশ্রাম করুন। ততক্ষনে আমি পূজাহ্নিক সেরে নিই। আপনি একটি পান খান। তার পর আমরা আনন্দ সহকারে কথাবার্তা বলব।" এই বলে উনি ভেতরে চলে যান। বারান্দায় বসে-বসে হেমাডপন্তের দৃষ্টি জানলার উপরে রাখা 'নাথ ভাগবতের' উপর পড়ে। 'নাথ ভাগবৎ' শ্রী একনাথ দ্বারা রচিত শ্রীমদভাগবতের একাদশ স্কন্ধের মারাঠী ভাষায় লেখা একটি প্রসিদ্ধ টীকা। শ্রী সাইবাবার আজ্ঞানুসারে শ্রী বাপুসাহেব যোগ এবং শ্রী কাকাসাহেব দীক্ষিত শিরডীতে নিত্য ভগবতগীতা (মারাঠী টীকা যার নাম ভাবার্থ দীপিকা, সহিত) বা জ্ঞানেশ্বরী (কৃষ্ণ ও ভক্ত অর্জুন কথোপকথন), নাথ ভাগবৎ (শ্রীকৃষ্ণ - উদ্ধব কথোপকথন) এবং একনাথের মহান গ্রন্থ 'ভাবার্থ রামায়ণ' পড়তেন। ভক্তগণ বাবাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে, কখনো তিনি আংশিক উত্তর দিতেন এবং কখনো ওদের ভাগবৎ এবং প্রমুখ গ্রন্থগুলি শ্রবণ করতে বলতেন। সেগুলি শুনে ভক্তরা নিজেদের প্রশ্নের সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যেত। শ্রী হেমাডপন্ত 'নাথ ভগবৎ'-এর কিছু অংশ প্রতি দিন পড়তেন।

আজ ভোরবেলা, মস্‌জিদে যাওয়ার সময় কিছু ভক্তদের সৎসঙ্গের

দরুণ, উনি নিজের পাঠ অসম্পূর্ণ ছেড়ে দেন। জানলা থেকে গ্রন্থটি উঠিয়ে সেটি খুলতেই, নিজের অপূর্ণ পাঠের পৃষ্ঠাটি দেখে ওঁর খুব আশ্চর্য্য লাগে। উনি ভাবেন- "বাবা বোধহয় এই কারণেই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি নিজের বাকি পাঠটুকু সেরে নিতে পারি।" এই ভেবে উনি নিজের পাঠ শুরু করেন। পাঠ পুরো হতেই, শামাও বেরিয়ে আসেন এবং ওদের দুজনের মধ্যে কথোপকথন শুরু হয়। হেমাডপন্ত বলেন- "আমি বাবার একটি বার্তা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। উনি আমাকে আপনার কাছ থেকে ১৫ টাকা দক্ষিণা আনতে ও কিছুক্ষণ আপনার সাথে কথাবার্তা বলে আপনাকে আমার সাথে মস্‌জিদে ফিরে যেতে বলেছেন।" শামা অবাক হয়ে বলেন- "আমার কাছে তো এক পয়সাও নেই। তাই আপনি টাকার বদলে দক্ষিণায় আমার পনেরোটি নমস্কার নিয়ে যান।" তখন হেমাডপন্ত বলেন- "ঠিক আছে, আমি আপনার পনেরোটা নমস্কার স্বীকার করলাম। আসুন, এবার আমরা কিছু গল্প-গুজব করি, দয়া করে বাবার কিছু লীলা আমায় শোনান, যাতে আমার পাপ নষ্ট হয়।" শামা বললেন- "তাহলে একটু বসুন! এই ঈশ্বরের লীলা অদ্ভুত। কোথায় আমি একটা অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ আর আপনি কত বিদ্বান ব্যক্তি। এখানে আসার পর, আপনি বাবার অনেক লীলা দেখেছেন। সেগুলি আপনার সামনে কি করেই বা বর্ণনা করি? আচ্ছা, এই পান-সুপুরী খান, ততক্ষণ আমি কাপড়টা পরে নিই।"

একটু পরে শামা ফিরে আসেন এবং তারপর দুজনের মধ্যে এভাবে কথোপকথন শুরু হয়-

শামা বললেন- "এই পরমেশ্বরের (বাবা) লীলা অন্তহীন, যার কোন কূল নেই। তিনি তো লীলায় নির্লিপ্ত থেকে সদাই বিনোদ

করেন। সেগুলি আমরা চাষারা কি বা বুঝতে পারব? বাবা স্বয়ংই কেন বললেন না? আপনার মত বিদ্বানকে আমার মত মূর্খের কাছে কেন পাঠালেন? তাঁর কার্য্যপ্রণালী বোঝা কঠিন। আমি শুধু এতটাই বলতে পারি সেগুলি লৌকিক নয়।" এরকম ভূমিকার পরে, শামা বলেন- "এবার আমার একটা ঘটনা মনে পড়েছে, যেটা আমি ব্যক্তিগত রূপে জানি। **যেমন ভক্তদের নিষ্ঠা ও ভাব হয়, বাবাও তাদের তেমনই সাহায্য করেন। কখনো-কখনো তো বাবা ভক্তের কঠিন পরীক্ষা নেওয়ার পরই, তাকে উপদেশ দেন।"** 'উপদেশ' শব্দটি শুনে সাঠের গুরু চরিত্র পাঠের ঘটনাটি তক্ষুনি মনে পড়ায় হেমাডপন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। উনি ভাবেন- "বাবা বোধহয় আমার মনের অস্থিরতা দূর করার জন্যই আমায় এখানে পাঠিয়েছেন।" তবুও নিজের মনের কথা প্রকাশ না করে, শামার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে লাগলেন। সেই সব কাহিনীগুলির কেবল একটাই বক্তব্য দেখা যাচ্ছিল যে, বাবার মন নিজের ভক্তদের প্রতি গভীর দয়া ও স্নেহে ভরা। লীলাগুলি শ্রবণ করে, হেমাডপন্ত আন্তরিক উল্লাস অনুভব করছিলেন। এবার শামা নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন -

শ্রীমতি রাধাবাঈ দেশমুখ ঃ-

একসময় এক বৃদ্ধা, শ্রীমতি রাধাবাই দেশমুখ - খাশাবা দেশমুখের মা-বাবার নাম শুনে সঙ্গমনেরের কিছু লোকেদের সাথে শিরডী আসেন। বাবার শ্রীদর্শন পেয়ে উনি অতি প্রসন্ন হন। শ্রী সাই চরণে ওঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। তাই উনি স্থির করেন যে, বাবার কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করবেন। আমরণ অনশনের দৃঢ় নিশ্চয় করে উনি

নিজের বিশ্রাম গৃহে এসে অন্ন-জল ত্যাগ করেন। এই ভাবে তিন দিন কেটে যায়। আমি এই বৃদ্ধার অগ্নিপরীক্ষা দেখে ভয় পেয়ে যাই এবং বাবাকে প্রার্থনা করে- বলি "দেব! আপনি আবার এটা কি শুরু করেছেন? কত লোকেদেরই তো আপনি এখানে টেনে আনেন। আপনি তো ঐ বৃদ্ধ মহিলাকে চেনেন। যদি আপনি ওঁকে কৃপা করে উপদেশ না দেন আর দুভার্গ্যবশতঃ ওঁর যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে লোকেরা অকারণে আপনাকেই দোষ দেবে। সবাই বলবে বাবার কাছে উপদেশ না পাওয়ার জন্যই, ওর মৃত্যু হয়েছে। তাই দয়া করে ওঁকে আশিস ও উপদেশ দিন।" বৃদ্ধার এই রূপ দৃঢ় সংকল্প দেখে, বাবা ওঁকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। মধুর উপদেশ দিয়ে, ওর মনোবৃত্তি পরিবর্তিত করে বলেন- "মা! কেন মিছিমিছি তুমি যাতনা সহ্য করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চাইছ? তুমি আমার মা এবং আমি তোমার ছেলে। তুমি আমার উপর দয়া করো এবং আমি যা বলছি সেটা মন দিয়ে শোন, আমি স্বয়ং নিজের কাহিনী তোমায় শোনাচ্ছি এবং তুমি যদি মন দিয়ে সেটা শোনো, তাহলে তুমি অবশ্যই পরম শান্তি লাভ করবে। আমার গুরুর, আমার উপর খুব দয়া ভাব ছিল। তিনি অতি উচ্চকোটীর সাধু ছিলেন। দীর্ঘকাল আমি তাঁর সেবা করি, তবুও তিনি আমার কানে কোন মন্ত্র দেননি। আমি তাঁর থেকে কখনো দূরে যেতে চাইতাম না। আমার প্রবল উৎকণ্ঠা ছিল যে, তাঁর সেবা করে যেভাবেই সম্ভব হোক, মন্ত্র প্রাপ্ত করি। কিন্তু তাঁর রীতি অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথমে আমার মাথা নেড়া করে আমার কাছে দু'পয়সা দক্ষিণা চান, যেটা আমি তক্ষুনি দিয়ে দিই। যদি তুমি প্রশ্ন করো যে, আমার গুরু তো পূর্ণ নিষ্কাম ছিলেন - তবে পয়সা চাওয়াটা কি তাঁর পক্ষে শোভণীয় বলে মানা যেতে পারে? এবং তাহলে তাঁকে সর্বরূপে বৈরাগীও বা কিভাবে

বলা যেতে পারে? এর উত্তরে শুধু মাত্র এটাই বলা যায় যে, কাঞ্চণকে তিনি সরিয়ে দিতেন, স্বপ্নেও তাঁর এসবের প্রয়োজন ছিল না। ঐ দু'পয়সার অর্থ হলো - **১)** দৃঢ় নিষ্ঠা **২)** ধৈর্য্য। যখন আমি এ দু'টি বস্তু তাঁকে অর্পণ করে দিই, তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। আমি বারোটি বছর তাঁর শ্রীচরণের সেবায় কাটাই। তিনি আমার ভরন-পোষণ করেন। অতএব আমার ভোজন বা বস্ত্রের কোন অভাব হয়নি। তিনি প্রেমের মূর্তি ছিলেন। অথবা বলা যেতে পারে যে, তিনি প্রেমের সাক্ষাৎ অবতার ছিলেন। আমি তাঁর সঠিক বর্ণনাই বা কিভাবে করতে পারি? আমার প্রতি তাঁর খুব বেশী স্নেহ ছিল এবং এই রকম গুরু খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর দিকে চেয়ে দেখলে মনে হতো যেন, তিনি গম্ভীর মুদ্রায় ধ্যান-মগ্ন আছেন ও তখন আমরা দুজনেই আনন্দে বিভোর হয়ে উঠতাম। অষ্ট প্রহর তাঁর শ্রীমুখের দিকে এক পলকে চেয়ে থাকতাম। আমি ক্ষুধা বা তৃষ্ণার বোধ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাঁর দর্শন না পেলে, আমি অশান্ত হয়ে উঠতাম। আমার তো সর্বদা তাঁর কথাই মনে হত - তাঁর চিন্তাতেই ধ্যানমগ্ন থাকতাম। অতএব আমার মন তাঁর চরণকমলেই লীন হয়ে যায়। এটা হলো প্রথম পয়সার দক্ষিণা। ধৈর্য্য হলো দ্বিতীয় পয়সা। আমি ধৈর্য্য ধরে বহুকাল গুরুসেবা করি। এই ধৈর্য্যই তোমাকেও ভবসাগর পার করিয়ে দেবে। ধৈর্য্যই তো মানুষের মনুষত্ব। ধৈর্য্য ধারণ করলেই সমস্ত পাপ এবং মোহ নষ্ট হয়ে সব রকমের বিপদ দূর হয় ও ভয় শেষ হয়ে যায়। এই ভাবে তুমিও নিজের লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারবে। ধৈর্য্য তো সমস্ত গুণের খনি এবং সৎবিচারের জননী। নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য ঠিক যেন দুটি যমজ বোন, যাদের মধ্যে থাকে প্রগাঢ় প্রেম।

"আমার গুরু আমার কাছে কোন কিছু আশা করতেন না। তিনি

কখনো আমায় অবহেলা করেননি, বরং তিনি আমাকে সর্বদা রক্ষাই করেছেন। যদিও আমি সব সময় তাঁর চরণের কাছেই থাকতাম, তবুও কদাচিত্ অন্য জায়গায় গেলেও আমার প্রতি তাঁর প্রেম কম হয়নি। তাঁর কৃপাদৃষ্টি সর্বদা আমার উপর বর্ষিত হত। যেরূপ কচ্ছপী তার প্রেম দৃষ্টি দিয়ে নিজের বাচ্চাদের লালন-পালন করে, তারা নদীর এপারে হোক অথবা ওপারে। তাই মা, আমার গুরু তো আমায় কোন মন্ত্র শেখাননি, আমি কি করে তোমার কানে মন্ত্র দিই ? কেবল এইটাই মনে রেখো যে, কচ্ছপ-মায়ের মত শুধু গুরুর প্রেমদৃষ্টির সাহায্যে আমরা সন্তুষ্টি প্রাপ্ত করতে পারি। তাই **শুধু-শুধু কারো থেকে উপদেশ পাবার চেষ্টা কোর না। আমাকেই নিজের বিচারের ও কর্মের লক্ষ্য মানো এবং তখনই তুমি নিঃসন্দেহে পরমার্থ লাভ করবে। আমার দিকে অনন্য ভাবে দেখলে আমিও তোমার দিকে সে ভাবেই দেখব। এই মস্‌জিদে বসে আমি সত্য কথাই বলি। কোন সাধনা বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দরকার নেই। কেবল গুরুর কথায় বিশ্বাসই পর্যাপ্ত। সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখো যে, গুরুই কর্তা। সে মানুষই ধন্য, যে গুরুর মহানতা বা গুরুত্ব বুঝে তাঁকেই হরি, হর ও ব্রহ্মার (ত্রিমূর্তি) অবতার মানে।"** এই ভাবে বোঝানোর পর বৃদ্ধ মহিলা সান্ত্বনা পান ও বাবাকে প্রণাম করে উপবাস ত্যাগ করেন। এই কাহিনীটি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে এবং তার উপযুক্ত অর্থটির বিষয় বিচার করে, হেমাডপন্তের খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। ওঁর মন ভরে ওঠে ও উনি রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত আনন্দ-বিভোর হয়ে,

ওঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোয় না। ওঁর এরকম অবস্থা দেখে শামা জিজ্ঞাসা করেন- "আপনি এই ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছেন কেন? বাবার এই ধরনের লীলা তো অনেক আছে, সেগুলির বর্ণনা আমি কোন মুখ দিয়ে করি?"

ঠিক সেই সময় মস্‌জিদে ঘন্টা বাজতে শুরু করে, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন পূজো ও আরতি শুরু হওয়ার সংকেত। তখন শামা ও হেমাডপন্ত শীঘ্রই মস্‌জিদের দিকে রওনা হন। বাপুসাহেব যোগ পূজো সবে আরম্ভ করেছেন; মহিলারা উপরে দাঁড়িয়েছিল ও পুরুষেরা নীচে মণ্ডপে। সবাই উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্রের সাথে আরতি গাইছিল। তখনই হেমাডপন্তের হাত ধরে শামা উপরে উঠে যান। উনি বাবার ডান দিকে ও হেমাডপন্ত বাবার সামনে গিয়ে বসেন। ওঁদের দেখে বাবা শামার দক্ষিণাটি চান। তখন হেমাডপন্ত উত্তর দেন- "টাকার বদলে শামা আপনাকে পনেরোটা নমস্কার পাঠিয়েছেন এবং স্বয়ং এখানে উপস্থিত আছেন।" বাবা বললেন- "আচ্ছা, ঠিক আছে। এবার আমায় বলো তোমরা নিজেদের মধ্যে কি বিষয়ে আলোচনা করছিলে?" তখন ঘন্টা, ঢোল ও সামূহিক গানের আওয়াজের দিকে কান না দিয়ে, হেমাডপন্ত উৎকণ্ঠাপূর্বক সেই বার্তালাপ শোনাতে শুরু করেন। বাবাও সমান উৎসাহী। তাই বালিশে হেলান ছেড়ে, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে গেলেন। হেমাডপন্ত বলেন- "আলোচনাটি খুবই সুখদায়ক ছিল, বিশেষ করে ঐ বৃদ্ধ মহিলাটির কাহিনী খুব অদ্ভুত লাগল। সেটি শুনে আমার মনে হলো যে, আপনার লীলা অন্তহীন এবং এই কাহিনীটির মাধ্যমে, আপনি আমার উপর বিশেষ কৃপা বর্ষণ করেছেন।" তখন বাবা বললেন- "এ তো বড় আশ্চর্য্যর কথা! আমার কৃপা তোমার উপর কি করে হলো, খুলে বলো তো, শুনি।" তখন

একটু আগে শোনা ঘটনাটি, যেটি ওঁর হৃদয় পটলে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল, বাবাকে শুনিয়ে ফেললেন। বাবা গল্পটি শুনে অতি প্রসন্ন হয়ে বলেন- "এর অর্থটাও কি তুমি বুঝতে পেরেছ?" তখন হেমাডপন্ত উত্তর দেন- "আজ্ঞে বাবা, বুঝতে পেরেছি। তাই আমার মনের চঞ্চলতা নষ্ট হয়ে গেছে। এবার যথার্থরূপে আমি বাস্তবিক শান্তি ও সুখ অনুভব করছি এবং আমি সত্য পথটি জেনে গেছি।" তখন বাবা বলেন- "শোন, আমার পদ্ধতিও অদ্বিতীয়। যদি এই গল্পটা মনে রাখো তাহলে তোমার খুবই লাভ হবে। **আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য ধ্যান অত্যন্ত আবশ্যক** এবং যদি তুমি এটির নিরন্তর অভ্যাস করো, তাহলে কুপ্রবৃত্তিগুলি শান্ত হয়ে যাবে। আসক্তিশূণ্য হয়ে সর্বদাই তোমার ঈশ্বরের ধ্যান করা উচিত। তিনি সব প্রাণীদের মধ্যে ব্যাপ্ত এবং এইরূপ মন একাগ্র হয়ে গেলে তুমি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আমার নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের ধ্যান করো। যদি তা না পারো, তবে তুমি আমায় এখানে দিন-রাত যেমনটি দেখো সেই রূপই ধ্যান করো। এই ভাবে তোমার বৃত্তিগুলি এক জায়গায় কেন্দ্রিত হয়ে যাবে এবং ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেয়ের পৃথকত্ব নষ্ট হয়ে, ধ্যাতা চৈতন্যের সাথে একত্ব প্রাপ্ত করে ব্রহ্মের সাথে অভিন্ন হয়ে যাবে। কচ্ছপী নদীর এপারে থাকে ও তার বাচ্চারা ওপারে। ও তাদের দুধ খাওয়ায় না আর বুকের সাথে জড়িয়েও রাখে না। শুধু তার প্রেম-দৃষ্টি দিয়েই তাদের লালন-পালন হয়ে যায়। বাচ্চাগুলিও কিছু না করে শুধু মা'-র কথাই স্মরণ করতে থাকে। কচ্ছপ-মা শুধু তার হিতকর ও স্নেহদৃষ্টি দিয়েই ঐ ছোট-ছোট শিশুগুলিকে অমৃততুল্য আহার ও আনন্দ প্রদান করে। এমনি হচ্ছে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ।" বাবা এই শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করা মাত্রই আরতি শেষ হয়ে যায়। সবাই উচ্চস্বরে বলে

ওঠে- "শ্রী সচ্চিদানন্দ সদ্‌গুরু সাইনাথ মহারাজের জয়।" প্রিয় পাঠকগণ! কল্পনা করুন যে, আমরা সবাই এই সময় ঐ ভীড়ের ও জয়জয়কার ধ্বনির মাঝে সম্মিলিত আছি।

আরতি শেষ হওয়ার পর প্রসাদ বিতরণ হয়। বাপু সাহেব যোগ রোজকার মতন এগিয়ে আসেন এবং বাবাকে প্রণাম করে কিছু মিছরি দেন। বাবা এই মিছরি হেমাডপন্তকে দিয়ে বলেন- "যদি তুমি এই কাহিনীটি ভাল ভাবে সব সময় মনে রাখো, তাহলে তোমার অবস্থাও এই মিছরির ন্যায় মিষ্টি হয়ে তোমার সমস্ত ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তুমি চিরসুখী হবে।" হেমাডপন্ত বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে স্তুতি করেন- "প্রভু! দয়া করে এই ভাবে সদৈব আমায় রক্ষা করবেন।" তখন বাবা হেমাডপন্তকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন যে ওঁর বাবার কথাগুলি শ্রবণ করে নিত্য মনন এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বকে গ্রহণ করা উচিত। তখন ঈশ্বরের এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মরণ ও ধ্যানের ফলস্বরূপ তিনি স্বয়ং হেমাডপন্তের সামনে নিজের স্বরূপকে প্রকট করবেন। প্রিয় পাঠকগণ, হেমাডপন্ত সেই সময় মিছরির প্রসাদ পেয়েছিলেন, তাই আজ আমরা এই কথামৃত পান করার সুযোগ পেয়েছি। আসুন, আমরাও ঐ কথা মনন করি এবং তার সারতত্ত্ব গ্রহণ করে বাবার কৃপায় সুস্থ ও সুখী হই।

১৯ অধ্যায়ের শেষে হেমাডপন্ত কিছু আরো ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, যেগুলি এখানে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের ব্যবহারের বিষয় বাবার উপদেশ ঃ-

নিম্নলিখিত অমূল্য বচন সর্বসাধারণ ভক্তদের জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং যদি সেগুলি মনে রেখে আচরণ করা হয় তো সর্বদা কল্যাণ হবে। যতক্ষন কারো সাথে পূর্ব সম্পর্ক বা সম্বন্ধ না থাকে, ততক্ষন

কেউ কারো সম্মুখীন হয় না। যদি কোন মানুষ বা প্রাণী তোমার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার সাথে অভদ্রতা কোর না। ওকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্মানজনক ব্যবহার কোর।

যদি তৃষ্ণার্তকে জল, ক্ষুধার্তকে ভোজন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র এবং আগন্তুককে নিজের দালানটি বিশ্রাম করার জন্য দাও, তাহলে ভগবান শ্রীহরি তোমার উপর নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। যদি কেউ তোমার কাছে কোন জিনিষ চায় ও তোমার দেওয়ার ইচ্ছে না থাকে তো দিও না, কিন্তু তার সাথে অভদ্র ব্যবহার কোর না। সে যতই তোমার নিন্দে করুক, তবুও কটু উত্তর দিয়ে তুমি তার উপর রাগ কোর না। এই ভাবে এই ধরনের প্রসঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে চললে, তুমি নিশ্চিতই সুখী হবে। পৃথিবী ওলট্-পালট্ হয়ে যাক, কিন্তু তোমার স্থির থাকা উচিত। সব সময় নিজের স্থানে স্থির থেকে গতিমান দৃশ্যটি শান্ত হয়ে দেখো। একে-অন্যকে আলাদা করে যে ভেদ ভাবের (দ্বৈত) দেওয়াল, সেটা নষ্ট করে দাও যাতে আমাদের মিলন সহজতম হয়ে যায়। দ্বৈত ভাবই (অর্থাৎ আমি আর তুমির ভেদ-বৃত্তি) শিষ্যকে নিজের গুরুর থেকে পৃথক করে দেয়। তাই যতক্ষন এটি ধ্বংস না হয়ে যায় ততক্ষন অভিন্নতা প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। "আল্লাহ মালিক" অর্থাৎ ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান এবং তিনি ছাড়া সংরক্ষকও আর কেউ নেই। তাঁর কার্য্যপ্রণালী অলৌকিক, অতুলণীয় ও কল্পনার অতীত। তাঁর ইচ্ছেতেই সব কাজ হয়। তিনিই পথ প্রদর্শন করে সব ইচ্ছে পুরণ করে দেন। ঋণানুবন্ধের কারণেই আমাদের সাক্ষাৎ বা সঙ্গম হয়। তাই পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব নিয়ে একে-অন্যের সেবা করে সব সময় সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে নিজের জীবনের লক্ষ্য (ঈশ্বর দর্শন) প্রাপ্ত করে নিয়েছে, সেই ধন্য ও সুখী। অন্যরা তো নামে মাত্র যতক্ষন

প্রাণ আছে, ততক্ষণ জীবিত থাকে।

উত্তম বিচারকে উৎসাহদান ঃ-

শ্রী সাইবাবা সর্বদা উত্তম বিচারকে উৎসাহিত করতেন। তাই আমরা যদি প্রেম ও ভক্তি ভরে অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যাই তাহলে সহজেই অনুভব করতে পারব যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি আমাদের কি ভাবে সাহায্য করেন। এক সাধুর উক্তি অনুসারে, ভোরবেলা যদি তোমার মনে কোন উত্তম বিচার জাগে এবং সারাদিন সেটাই স্মরণ করলে, তোমার বিবেক অত্যন্ত বিকশিত হয়ে মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। হেমাডপন্ত এই উক্তিটির সত্যতা অনুভব করতে চাইতেন। তাই এই পবিত্র শিরডী ভূমিতে পরের দিনটি (বৃহস্পতিবার) নামস্মরণ ও কীর্তন করে কাটাবেন, এইরূপ মনোস্থির করে শুয়ে পড়েন। পরের দিন ভোরবেলা ওঠার সময়, অনায়াসেই রাম নাম মুখে এসে যায় এবং তিনি খুবই প্রফুল্ল হন। নিত্যকর্ম সেরে কিছু ফুল নিয়ে বাবার দর্শন করতে যান। দীক্ষিত 'ওয়াড়া' পার করে বুটী 'ওয়াড়া'র পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়, একটি মধুর ভজনের আওয়াজ শুনতে পান। একনাথের এই ভজনটি ঔরাঙ্গাবাদকর মধুর সুরে বাবার সামনে গাইছিলেন -

গুরু-কৃপার ছায়া পেয়েছি ভাই।
রাম ছাড়া তো কিছুই নাই।
অন্তরে রাম, বাহিরে রাম,
স্বপ্নেও দেখি সীতারাম।।
জাগরনে রাম, শয়নে রাম।
যেদিকে দেখি, সেদিকেই রাম।।

ভজন তো অনেক আছে, কিন্তু বিশেষ করে এই ভজনটাই ঔরাঙ্গাবাদকর কেন বেছে নিলেন? এটা বাবারদ্বারাই পরিকল্পিত বিচিত্র যোগাযোগ নয় কি? সবাই রামনামের জপকে প্রভাবসম্পন্ন এবং ভক্তদের ইচ্ছাপূর্তি ও কষ্ট হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অব্যর্থ উপায় বলেন। এ বিষয়ে সব সন্তদেরও একই মত।

নিন্দে সম্বন্ধীয় উপদেশ

উপদেশ দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ সময় বা স্থানের প্রতীক্ষা না করে বাবা যথাযোগ্য সময়েই উপদেশ দিতেন। একবার এক ভক্ত বাবার অনুপস্থিতিতে অন্য লোকেদের সামনে নিজের ভাইয়ের নিন্দা করছিল ও নিজের ভাইদের ওপর দোষারোপ করে, এমন কটু বাক্য ব্যবহার করে যে, সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকটি লোকের ঘৃণা হতে লাগল। প্রায়ই দেখা গেছে যে, লোকেরা মিছিমিছি অন্যদের নিন্দে করে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। সাধুপুরুষেরা পরের দোষকে অন্য দৃষ্টি দিয়ে দেখেন। তাদের বক্তব্য যে, শুদ্ধিকরণের নানা পদার্থ আছে, যেমন- মাটি, জল ও সাবান ইত্যাদি, কিন্তু নিন্দুকের পদ্ধতি একেবারে ভিন্ন। ওরা অন্যদের দোষগুলিকে শুধু নিজেদের জিভ দিয়েই দূর করে দেয় এবং এই ভাবে অন্যদের নিন্দে করে তাদের উপকারই করে। তাই তারা নিশ্চিতই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। নিন্দুককে ঠিক পথে আনার জন্য সাইবাবার কার্য্যপদ্ধতি একেবারেই অন্যরকম ছিল। তিনি তো সর্বজ্ঞ, তাই সেই মহাশয়ের কার্য্যকলাপ অবিলম্বেই জেনে যান। দুপুরবেলা যখন লেণ্ডীর কাছে সেই মহাশয়ের সাথে দেখা হয়, তখন তিনি একটি শূয়োরের (যে বিষ্ঠা খাচ্ছিল) দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন- "দেখ, ও কত আনন্দ সহকারে বিষ্ঠা খাচ্ছে। তুমি মন ভরে নিজের ভাইদের বিষয়ে অপশব্দ বলে বেড়াচ্ছ এবং তোমার

এই আচরণটাও ঠিক ওরই সমান। **অনেক শুভকর্মের পরিণাম স্বরূপই তুমি এই মানব দেহ পেয়েছ এবং তাও যদি তুমি এই ধরনের আচরণ করো তো শিরডী তোমায় কি ভাবেই বা সাহায্য করতে পারবে?"** ভক্তটি এই উপদেশটি গ্রহণ করে সেখান থেকে চলে যায়। এইরূপ প্রসঙ্গ অনুসারেই তিনি উপদেশ দিতেন। যদি সেগুলি মনে রেখে নিত্য পালন করা হয় তাহলে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বেশী দূরে থাকে না। একটা প্রবাদ আছে যে - "যদি হরি থাকে, তাহলে খাটিয়ার উপরে খাবার মেলে।" এই কথাটি খাওয়া ও পরার ব্যাপারে সত্য হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এই কথার উপর নির্ভর করে, অলস হয়ে বসে থাকে, তাহলে সে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোনই উন্নতি করতে পারবে না বরং পতনের ঘোর অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। তাই আত্ম-অনুভূতি প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের অনবরত পরিশ্রম করা উচিত। যত চেষ্টা সে করবে, ততই সেটা তার জন্য লাভদায়ক হবে। বাবা বলতেন- **"আমি তো সর্বব্যাপী। সর্বভূতে ও চরাচরে ব্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আমি অনন্ত।"** যাদের দৃষ্টিতে তিনি সাড়ে তিন হাতের মানুষ, তাদের ভ্রম দূর করার জন্যই স্বয়ং সগুণ রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই **যে ভক্তরা অনন্য ভাবে তাঁর ধ্যান করে তারা তাঁর সাথে অভিন্নতা প্রাপ্ত করে,** যেমন মিষ্টত্ব ও মিছরি, ঢেউ ও সমুদ্র এবং চোখ ও কান্তির মধ্যে অভিন্নতা দেখা যায়। যারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি চায়, তাদের শান্ত এবং স্থির হয়ে ধার্মিক জীবনযাপন করা উচিত। অনাবশ্যক কটু শব্দ ব্যবহার করে কাউকে দুঃখ না দিয়ে, সর্বদা ভালো কাজে ও

কর্তব্যে সংলগ্ন থেকে, ভয় মুক্ত হয়ে অনন্য ভাবে তাঁর শরণে যাওয়া উচিত। যারা পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর লীলাগুলি শ্রবণ করে মনন করবে এবং অন্যান্য বস্তুর চিন্তা ছেড়ে দেবে, তারা নিঃসন্দেহে আত্ম-অনুভূতি প্রাপ্ত করবে। তিনি অনেককেই নাম জপ করে তাঁর শরণাগত হতে বলেছিলেন। 'আমি কে?' এই তত্ত্বটি জানবার জন্য যারা উৎসুক ছিল, বাবা তাদেরও লীলা শ্রবণ ও মনন করতে পরামর্শ দেন। কাউকে ভগবত লীলার শ্রবণ, কাউকে ভগবৎ পাদ পূজন, তো কাউকে আধ্যাত্মরামায়ণ ও জ্ঞানেশ্বরী বা অন্য ধার্মিক গ্রন্থের পাঠ ও অধ্যয়ন করতে বলতেন। কাউকে রাখতেন নিজের চরণের কাছে, তো কাউকে পাঠাতেন খাণ্ডোবা মন্দিরে। কাউকে বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করতে বলতেন তো কাউকে উপনিষদ অধ্যয়ন বা গীতা পাঠ করতে বলতেন। তাঁর উপদেশের কোন সীমা ছিল না। তিনি কাউকে প্রত্যক্ষ তো কাউকে স্বপ্নে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একবার তিনি এক মদ্যপের স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার বুকে চড়ে বসেন। যখন সে মদ খাওয়া ছাড়ার শপথ নেয়, তখন গিয়ে বাবা তাকে ছাঁড়েন। কাউকে মন্ত্র যেমন "গুরুব্রহ্মা" আদি মন্ত্রের অর্থ স্বপ্নে বোঝান এবং কিছু হঠযোগীদের হঠযোগ ছেড়ে চুপচাপ বসে ধৈর্য্য রাখতে নির্দেশ দেন। তাঁর সহজতম পথ ও বিধির বর্ণনা করা অসম্ভব। সাধারণ সাংসারিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি নিজের আচরণের মাধ্যমে অনেক উদাহরণ দিতেন। তারই একটি নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে -

পরিশ্রমের জন্য মজুরী ঃ-

একদিন বাবা শ্রীমতি রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ীর সামনে এসে একটা সিঁড়ি আনতে বলেন। সিঁড়িটি এনে বাবার আদেশ অনুযায়ী সেটা বামন গোঁদকরের (পাশের বাড়ীটি) বাড়ীতে লাগানো হয়। বাবা বাড়ীর

উপরে চড়ে যান এবং রাধাকৃষ্ণমাঈয়ের বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে হয়ে অন্য দিক্ দিয়ে নীচে নেমে আসেন। বাবার অভিপ্রায়টি কেউ বুঝতে পারে না। রাধাকৃষ্ণমাঈ সে সময়ে জ্বরে কাঁপছিলেন। হতে পারে যে, ওঁর জ্বর ঠিক করার জন্যই তিনি এইরকমটি করেন। নীচে নেমে যে লোকটি সিঁড়ি এনেছিল, তাকে তিনি দু'টাকা পারিশ্রমিক দেন। তখন একজন একটু সাহস করে জিজ্ঞাসা করে যে, এতটা টাকা দেওয়ার কি মানে হয়? বাবা উত্তরে জানান যে **মূল্য না দিয়ে কাউকে দিয়ে পরিশ্রম করানো উচিত নয়** এবং কর্মীকে অবিলম্বে তার শ্রম অনুসারে, উদার হৃদয়ে, মজুরী দিয়ে দেওয়া উচিত।

।। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम् भवतु।।